সম্পাদকীয়

কল্যাণময় এক মহান তাহরীক ওয়াকফে জাদীদ

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) করেছিলেন। যাঁকে লাভ করার জন্য এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিরবে-নিভৃতে একাধারে চল্লিশ দিন, হুশিয়ারপুরে দোয়ায় রত ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবাদ পেয়ে তাঁর জন্ম, ব্যক্তিত্ব, কর্মময় জীবন সম্পর্কে তাঁর জন্মের পূর্বেই সমগ্র জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর জন্মের পর বাস্তবিকই যিনি এক অসাধারণ প্রতিভা, অতুলনীয় জ্ঞান, অত্যন্ত সূক্ষদর্শী ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘ ৫২ বছর জামা'তে আহমদীয়ার খিলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে এক নি:স্ব দুর্বল, ছোট ও অসহায় জামা'তকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি জামা'তের উন্নতিকল্পে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক করে গেছেন, তেমনি একটি তাহরীক 'ওয়াকফে জাদীদ'। এ মহান ঐশী তাহরীকের কার্যকাল প্রতি বছর জানুয়ারী থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বরে শেষ হয়। এ তাহরীক হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনের শেষ তাহরীক যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐশী তাহরীক।

জামা'তে আহমদীয়ার তালিম-তরবিয়তের জন্য তিনি (রা.) যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে 'ওয়াকফে জাদীদ' অন্যতম। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কুরআন শরীফের তালিম, জামা'তের শিক্ষা, শিশু কিশোরদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে তিনি এ তাহরীকের সূচনা করেন। তিনি চেয়েছিলেন, জামা'তের একদল নিবেদিত প্রাণ যুবক যারা বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে সুফিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে কেরামদের মত ইসলাম ও কুরআনের আলো ছড়াবার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে।

তিনি (রা.) বলেছিলেন, আজও এমনই সময়, যখন আমাদের যুবকেরা যাদের অন্তরে আত্মত্যাগের এবং কুরবানীর প্রেরণা আছে, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে, নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে অন্য অঞ্চলে গিয়ে নিজেদের জন্মস্থানের মত করে বসবাস করবে। আস্তে আস্তে আশেপাশের এলাকায় ইসলামের আলো বা ঈমানের আলো ছড়াবে। তারা নিজেকে আমার সামনে ওয়াক্ফ করবে। আমার মতে এটা কোন অসম্ভব কাজ নয়। (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭)

এই পরিকল্পনাকে যথারীতি 'ওয়াকফে জাদীদে'র তাহরীক আকারে তিনি (রা.) ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৭ ইং জলসা সালানার যুগান্তকারী ভাষণের মাধ্যমে ঘোষণা দিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, এ ওয়াক্ফ দিয়ে আমার উদ্দেশ্য এই যে, পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত আমরা মোয়াল্লেমিনের জাল বিছিয়ে দিতে চাই। সমস্ত অঞ্চলে দশ-পনের মাইল পর পর আমাদের মোয়াল্লেম অবস্থান করবেন। তিনি সেখানে মাদ্রাসা চালু করবেন, অথবা দোকান চালু করবেন। তিনি সেখানে অবস্থান করবেন এবং মানুষের মাঝে নিজের কর্তব্য পালন করবেন। যদিও স্কীম অনেক ব্যাপক ও বড়, কিন্তু খরচের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আপাতত মাত্র দশ জন মোয়াল্লেম দিয়ে কাজ আরম্ভ করা হবে। সম্ভবত কোন কোন মোয়াল্লেমকে আফ্রিকা হতেও নেয়া হতে পারে অথবা অন্য কোন দেশ থেকে। কিন্তু প্রথমত দশ জন দিয়ে শুরু হবে। তারপর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। এই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক হাজার পর্যন্ত যেতে পারে। (আল ফযল, রাবওয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮)

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে আজ হাজার হাজার ওয়াকফে যিন্দেগী যুবক রয়েছেন যারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে নিরলসভাবে প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের সেবা করে যাচ্ছেন। আমাদের সবার উচিত, এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা।

১৫ ডিসেম্বর ২০০৯

সূচীপত্র | *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** ২
- **হাদীস শরীফ** ৩
- **অমৃত বাণী** ৪
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** ৫-১১
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **কলেমা** ১২
  আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
- **নেযামে নও (নব বিশ্ব-ব্যবস্থা)** ১৩-১৬
  ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্
- **"সত্যের সন্ধানে" অনুষ্ঠান ও আমাদের পবিত্র দায়িত্ব** ১৭
- **পাকিস্তানে একজন আহমদী শিক্ষকের শাহাদত বরণ** ১৮
- **ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত** ১৯-২২
- **বেহেশ্‌ত কী!** ২৩-২৬
  মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
- **সংবাদ** ২৭-৩০
- **স্মৃতির পাতা থেকে** ৩১-৩২
- **কৃষিপাতা** ৩৩-৩৫
- **পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে** ৩৬
  সংকলন ও উপস্থাপনা : এম, আহমদ

প্রচ্ছদ ডিজাইন : তারেক আহমদ সবুজ

কুরআন শরীফ
সূরা হূদ-১১

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَ
مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

৭২। আর তার স্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সে মুখ টিপে হাসল। তখন আমরা তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ
اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ

৭৩। সে বললো, 'হায়রে আমার কপাল! আমি এক বৃদ্ধা এবং আমার এ স্বামী একজন বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমি নাকি সন্তান জন্ম দিব! নিশ্চয় এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!'

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ
عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

৭৪। তারা বললো, 'তুমি কি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে আশ্চর্য হচ্ছো? হে নবী পরিবার[১৩৩৩]! তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র কৃপা ও তাঁর আশিস বর্ষিত হোক। নিশ্চয় তিনি পরম প্রশংসাভাজন (ও) পরম মর্যাদাবান।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى
يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ

৭৫। এরপর ইব্‌রাহীমের ভয় যখন কেটে গেলো এবং তার কাছে সুসংবাদটি এসে গেলো তখন সে আমাদের[১৩৩৪] সাথে লূতের জাতির বিষয়ে বাক্‌বিতণ্ডা শুরু করে দিলো।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ

৭৬। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিল অতি সহিষ্ণু, কোমলহৃদয় (এবং) সদাবিনত।

يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ
رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ

৭৭। 'হে ইব্‌রাহীম! এ (সুপারিশ করা থেকে) বিরত হও। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ বলবৎ হয়ে গেছে। আর তাদের ওপর অবশ্যই এক অটল আযাব আসতে যাচ্ছে'।

১৩৩৩। এই আয়াতে 'গৃহের অধিবাসী' বলতে এখানে নিশ্চিতভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর স্ত্রীকেই বুঝিয়েছে, কেননা তখন পর্যন্তও তাঁর কোন সন্তান হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে নবীদের সম্পর্কে কুরআনে ব্যবহৃত 'আহলাল বায়ত' শব্দদ্বয় সাধারণত: নবীর স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে বুঝিয়েছে (২৮:১৩; ৩৩:৩৪)।

১৩৩৪। আদি পুস্তক-১৮:২১-৩৩ দ্রষ্টব্য)।

হাদীস শরীফ

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্বে খৃষ্টান ফৌজ নামবে। মদীনা হতে এক বাহিনী তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যাবে। এ বাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকগণ দিয়ে গঠিত হবে। সংগ্রাম শুরু হলে রোমান জাতিরা বলবে ঃ 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড় এবং তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উপস্থি'ত হতে দাও, যারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে'। কিন্তু মুসলমানগণ বলবে ঃ 'আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের সোপর্দ করব না।' যখন মুসলমানদের তৃতীয়াংশ বাহিনী পলায়ন করবে, আল্লাহ্ তাআলা এরূপ লোকদের 'তওবা' কবুল করবেন না। এ বাহিনীর অপর এক তৃতীয়াংশ শহীদ হবে। তারা আল্লাহ্ তাআলার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট শহীদরূপে গন্য হবে। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বিজয় লাভ করবে তারা আর কখনো পরীক্ষায় নিপতিত হবে না। এ বাহিনী কন্সটান্টিনোপল জয় করবে। যখন এ বাহিনী বিজয়লব্ধ ধন বন্টনে ব্যপৃত থাকবে, এবং তাদের তরবারি জৈতুন বৃক্ষে ঝুলতে থাকবে, এমন সময় এ বলে এক চীৎকার শোনা যাবে যে, 'মসীহুদ-দাজ্জাল' তোমাদের পিছনের এলাকায় প্রবেশ করেছে। তখন তারা সেখান থেকে বের হবে, জানা যাবে যে, সংবাদটি মিথ্যা। কিন্তু সিরিয়া পৌঁছতে পৌঁছতে দাজ্জালের অভ্যূদয় সত্য বলে পরিদৃষ্ট হবে। মুসলমানগণও প্রতিরোধের জন্য উপস্থিত হবে। যখন তারা কাতার ঠিক করতে থাকবে এবং নামাযের জন্য 'ইকামত' হতে থাকবে, এমন সময় মসীহ্ মাওউদ (আ.) অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদের ইমামতি করবেন। তিনি যখন দাজ্জালের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখন এমনি দ্রবীভূত হয়ে পড়বে, যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। আল্লাহ্ তাআলা মসীহ্ মাওউদের হাতে দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন এবং লোকগণকে তাঁর খঞ্জরে দাজ্জালের রক্ত প্রদর্শন করবেন।" এই পুরো ঘটনা ব্যাখ্যাপোযোগী দিব্য দর্শন, কাশফী নায্যারাহ মাত্র। ('মুসলিম; ২ঃ৩৯১)

হযরত মুসা বিন আলী তার পিতা হতে রেওয়ায়েত করেন যে, মুস্তাউরাদ কুরাইশী হযরত আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর সামনে রেওয়ায়েত করলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই বলতে শুনেছেন যে, যখন কিয়ামত কায়েম হবে তখন পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে রোমানগণ তথা খৃষ্টানরা। তারা বিজয় লাভ করবে। এতে হযরত আমর (রা.) মুস্তাউরাদকে বললেন, 'তুমি কি বলছো? ভালমত বুঝে শুনে নাও।" এতে মুস্তাউরাদ বললেন : আমি যা বলেছি, তা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট স্বয়ং শুনেছি।......এই খৃষ্টানদের চারটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। ফিৎনা-ফাসাদের সময় তারা মানুষের প্রতি অধিক গাম্ভীর্য ও বুদ্ধির পরিচয় দিবে : অতি সত্তর তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দিবে এবং ক্ষতি পুরণের যোগ্যতা রাখবে। পরাজয়ের পর ক্ষিপ্র গতিতে পুনরাক্রমণের চেষ্টা করবে তাদের নেতা, এতিম, মিসকিন ও দূর্বলদের স্বধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে। বাহ্যতঃ তাদের পঞ্চম বিশেষত্ব এই থাকবে যে, ব্যক্তির স্বৈর শাসনের যুলুম হতে জনসাধারণকে নিরাপদ রাখার দাবী করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান; বাবু ফি বাকিয়াতুম মিন আহাদিদে-দাজ্জাল; ২:৩৩৮ পৃ:)

['হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ থেকে]

অনুবাদ–মরহুম এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"হে সত্যান্বেষীগণ এবং ইসলামের সত্যিকার প্রেমিকগণ! আপনারা ভালভাবে জেনে রাখুন, আমরা যে যুগে বাস করছি তা এরূপ এক অন্ধকারময় যুগ যাতে ঈমান ও আমল সংক্রান্ত সব ক্ষেত্রে ভয়ানক বিকার দেখা দিয়েছে এবং চারদিক থেকে পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামীতার এক প্রচন্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ঈমান বলতে যা বুঝায়, আজ এর স্থান অধিকার করে বসেছে মুখে উচ্চারিত কিছু শব্দ। কয়েকটি প্রথা কিংবা অমিতাচারমূলক ও লোক দেখানো কাজকেই প্রকৃত সৎকাজ বলে মনে করা হয়েছে। আর যা প্রকৃত পুণ্য তা থেকে মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন। এ যুগের দর্শন বিজ্ঞানও আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথে কঠোর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে জ্ঞাত লোকদের ওপর এর আবেগ-অনুভূতি অত্যন্ত কুপ্রভাব সৃষ্টিকারী ও এদেরকে অন্ধকারের দিকে আকর্ষণকারী বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এটা বিষাক্ত উপদানকে ক্রিয়াশীল করে এবং ঘুমন্ত শয়তানকে জাগিয়ে তোলে। এ সকল জ্ঞানে পারদর্শীরা ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন কুধারণা সৃষ্টি করে বসে যে, তারা খোদা তাআলার নির্ধারিত নীতি-সমূহ এবং রোযা, নামায ইত্যাদি উপাসনার পদ্ধতিকে অবজ্ঞা ও উপহাসের চোখে দেখতে শুরু করে। তাদের হৃদয়ে খোদা তাআলার সত্তা সম্বন্ধেও কোন গুরুত্ব ও মাহাত্ববোধ নেই; বরং তাদের অধিকাংশই অধার্মিকতার রঙে রঙিন ও নাস্তিকতার ভাবধারায় নিমজ্জিত, আর মুসলমানের সন্তান পরিচয় দিয়েও তারা ধর্মের শত্রু। যারা কলেজে পড়ে তাদের অধিকাংশ নির্ধারিত শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই ধর্ম ও ধর্মের প্রতি সহানুভূতিকে বিদায় দিয়ে বসে।

এখানে আমি একটি মাত্র শাখার উল্লেখ করলাম, যা বর্তমান যুগের পথভ্রষ্টতার কুফলে ভরপুর। এ ছাড়া আরো শত শত শাখা আছে, যেগুলো এটার চেয়ে কম নয়। সাধারণত দেখা যায়, পৃথিবী থেকে বিশ্বস্ততা ও সততা এভাবে উঠে গেছে, তা যেন একেবারেই লোপ পেয়ে বসেছে। দুনিয়া অর্জনের জন্য প্রতারণা ও ধোঁকা সীমা অতিক্রম করেছে। যে ব্যক্তি সর্বাধিক ধূর্ত, তাকে সব চেয়ে যোগ্য মনে করা হয়। নানা ধরনের অসত্যতা, অসাধুতা, অবৈধ আচরণ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, নিকৃষ্ট ধরনের ধূর্ততা, লালসাপূর্ণ ষড়যন্ত্র এবং বজ্জাতীপূর্ণ স্বভাব ও আচরণ প্রসার লাভ করছে। আর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে চলেছে। পাশবিক হিংস্র প্রবৃত্তির এক ঝড় উঠেছে। এ সকল জ্ঞান -বিজ্ঞানে ও প্রচলিত রীতি-নীতিতে মানুষ যতই পারদর্শী ও চালক হচ্ছে ততই তাদের সচ্চরিত্রতা, পুণ্যকাজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, লজ্জা-শরম, খোদা-ভীতি, সততা ও সাধুতার স্বাভাবিক অভ্যাস কমে যাচ্ছে।

সততা ও ঈমানদারী বিলীন করে দেয়ার জন্য খৃষ্টানদের শিক্ষাও কয়েক ধরনের সুড়ঙ্গ তৈরী করছে। আর খৃষ্টানরা ইসলামকে নির্মূল করার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করছে এবং মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপায় সৃষ্টি করে তা রাহাজানীর প্রত্যেক সুযোগে ও পরিবেশে কাজে লাগাচ্ছে। তারা মুসলমানদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করার নতুন নতুন ব্যবস্থা ও তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার নিত্য নতুন উদ্ভাবন করছে। তারা সেই পূর্ণ মানবের কঠোর অবমাননা করছে, যিনি সাধুগণের গৌরব, খোদা তাআলার নৈকট্য প্রাপ্তগণের মুকুট এবং সম্মানিত নবীগণের নেতা। এমনকি অত্যন্ত শয়তানীর সাথে নাটকের অভিনয়ে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র পথ-প্রদর্শকের ছবি কদর্যভাবে দেখানো হচ্ছে এবং সং বের করা হচ্ছে।

(ফতেহ ইসলাম, বাংলা সংস্করণ পৃ: ৬-৭)

আল্লাহ্‌র ইবাদত কারী বান্দার কাজ হলো সর্বদা তওবা ও ইস্তোগফার করে যাওয়া।

আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে থাকার চেষ্টা করা। আর আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করা।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস কর্তৃক মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين] (آمين)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

(সূরা আল ফুরকান : ৬৪-৬৭)

এ সব আয়াতের অনুবাদ হল, রহমানের প্রকৃত বান্দা হল তারা যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা (কোন বিবাদ না করে) বলে 'সালাম'। যারা তাদের প্রভূর সমীপে সেজদাবনত ও দন্ডায়মান অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। যারা বলে, হে আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক! আমাদের ওপর থেকে তুমি দোযখের আযাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় এর আযাব সর্বনাশা। নিশ্চয় এটি অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবেও অতি মন্দ এবং দীর্ঘস্থায়ী ঠিকানা হিসেবেও। যারা খরচ করার সময় অপব্যয় করে না আবার কার্পণ্যও করে না বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকে না এবং ন্যায়-সংগত কারণ ব্যতীত এমন কোন প্রাণকে হত্যা করে না যাকে (হত্যা করাকে) আল্লাহ্ হারাম(অন্যায় ঘোষণা) করেছেন এবং ব্যভিচার করে না; বস্তুতঃ যে কেউ এমন কাজ করবে সে (তার) পাপের শাস্তির সম্মুখীন হবে। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা বৃথা বিষয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে তখন সসম্মানে অতিক্রম করে। এবং সে সব লোক, তাদেরকে যখন তাদের প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করানো হয় তখন এর প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না। এবং সে সব লোক যারা বলে, হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হতে চোখের পরিতৃপ্ততাদানকারী প্রশান্তি দান কর আর তুমি আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও। এরাই এমন লোক যাদেরকে তাদের সৎকর্মের ওপর ধৈর্যসহকারে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে প্রতিদানসরূপ (সুরম্য) বালাখানা দেয়া হবে এবং সেখানে তাদেরকে শুভাশীষ ও শান্তির বাণীর মাধ্যমে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। অস্থায়ী ও স্থায়ী হিসেবে এটা কতইনা উত্তম বাসস্থান।

রমযান মাস এলো এবং চলে গেল। এখনো লোকদের চিঠি আসছে। এ (চিঠি)গুলোর মাঝে রমযান মাসে লেখা চিঠিও রয়েছে এবং রমযানের পর লেখা ফ্যাক্সের মাধ্যমে পৌছা চিঠিও রয়েছে। (তারা লিখছেন) আল্লাহ্ এমন করুন, আমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পবিত্র পরিবর্তন সাধনের সর্বাত্তক চেষ্টা করে থাকি। আর যদি কোন পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে

তবে আল্লাহ্ তাআলা যেন তা জারিও রাখেন। আমাদের মধ্যে থেকে কারো কারো মাঝে এই যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে এটাই রমযানের উদ্দেশ্য। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা এর কিছু বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নাবলী বর্ণনা করেছেন যেগুলোর ওপর আমল করলে মানুষ নিজেকে ইবাদুর রহমান বলতে পারে। আমি যে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেছি তাতে যেসব বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হয়েছে তা আপনারা শুনেছেন। যাতে ব্যক্তিগত দায়িত্বাবলী, সামাজিক দায়িত্বাবলী এবং আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালনের প্রতিও দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে। এগুলোকে অর্জন করার জন্য যদি চেষ্টা করা হয় তবে আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকদেরকে ইবাদুর রহমান বলে সম্বোধন করার মাধ্যমে তাঁর সুন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়ে সু-সংবাদ দান করেন। তাঁর জান্নাতের সু-সংবাদ দান করেন। অতএব রমযানের পরেও যদি আমরা আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশিত পথে চলতে থাকি তবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব, তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব এবং এর অংশীদারিত্ব লাভ করব। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা যখন আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন তখন আমাদের মধ্য থেকে কারো মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হলে তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ইবাদুর রহমানের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, **ইয়ামশুনা আলাল আরযে হওনা** অর্থাৎ পৃথিবীতে সে নম্রতা ও সম্মানের সাথে চলে। সকল সিদ্ধান্তের বিষয়ে সে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। বিনা কারনে সে কখনো এমন কঠোরতা দেখায় না এবং রাগান্বিত হয় না পরবর্তীতে অনেক সময় যা অহংকার পর্যন্ত পৌছে দেয়। তাদের স্বভাবে বিনা কারণে স্থবিড়তাও থাকে না যার জন্য তাদের মাঝে আত্মসম্মানহীনতা ও তোশামদের প্রকাশ পেতে পারে। যে সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভবে নয় বরং জামাতী ভাবেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। জামাতী ভাবেও (তোমরা) আল্লাহ্ তাআলার বান্দা ও তাঁর ইবাদতকারী হওয়ার মাধ্যমে (নিজেদের মধ্যে) এ সব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি কর। এতে এ ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে যে, যারা ইবাদুর রহমান তারা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় প্রাপ্ত হবে। যখন বিজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন যেন (তোমাদের মাঝে) অহংকার সৃষ্টি না হয়, পুরাতন (নির্যাতনের) প্রতিশোধ নেয়ার প্রতি মনোযোগ না থাকে এবং তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলে যেও না বরং তোমাদেরকে ভদ্রতা, নম্রতা ও তাঁর বিধি বিধান সঠিকভাবে পালনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হল, **‘খাতাবাহুমুল জাহেলুনা কালু সালামুন’** এটা এ বিষয়েরও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এক দিক থেকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দার মাঝে ব্যক্তিগত ভাবে এ বৈশিষ্ট থাকা উচিত যে, ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে প্রত্যেক এমন নির্যাতনকারী এবং ঝগড়া বিবাদকারীদের বিনয়ের সাথে বুঝাও। আর দ্বিতীয়ত হল, আল্লাহ্ তাআলার প্রথম আদেশ হতে তোমরা যে নম্রতা/বিনয় অর্জন করেছ এবং একই ভাবে তোমাদের নিজেদের সমাজ ও এলাকায় তোমরা জামাতী দিক থেকে যে সম্মানের অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তোমরা যখন শক্তিশালী হবে তখনও এটি স্বরণ রাখবে। শয়তান তার কাজ করেই যাবে। তোমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে এমন কাজ করে বসবে যা তোমাদের আবেগকে উত্তেজিত করে তুলবে।এবং এটা বলা হবে যে, দেখ! এরা কত অত্যাচারী মানুষ।এমতাবস্থায় তোমাদের আবেগকে সংযত রাখ। সেই উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত কর, তা প্রতিষ্ঠিত কর যা আমাদের সামনে হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তার সাহাবারা উপস্থাপন করেছেন। এতেও জামাতীয়ভাবে পরবর্তী অবস্থা সর্বোত্তম হওয়ার ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে। কিন্তু এই সময় কিছু দেশে আর বিশেষ করে পাকিস্তানে এমন অবস্থা যে, আহমদীদেরকে বিরক্ত করা হয় তাদের আবেগ অনুভুতির **প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়।** চেষ্টা করা হয় কোনভাবে আহমদী এই ধরনের কর্মকাণ্ড যা বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে হচ্ছে কানুন নিজের হাতে নিয়ে নেয় আর তার পরে কানুনকে বাহানা বানিয়ে আহমদীদেরকে যুলুম নির্যাতনের পাত্র বানানো হয়।

তিনি বলেন এই শয়তানী তকদীরের মোকবেলায় রহমানের বান্দা হয়ে কানুনের আওতায় থেকে কর্মকান্ড কর। কিন্তু বন্দুকের উত্তর বন্দুক দিয়ে দিওনা। এথেকে কিছু সমস্যা অন্যান্য আহমদীদের এবং জামাতের হতে পারে।

সুতরাং আজকালের অবস্থা থেকে আমি আহমদীদের বলবো যে, এমন ইবাদুর রহমান বান্দা হওয়ার চেষ্টা কর যা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি থেকে অংশ পায় আর যেমনটি আমি বলেছি এতে আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যদ্বানীও রেখেছেন। এমন জামাত এক সময় তোমাদের অনেক উপরে উঠে যাবে ইনশাল্লাহ। সেই সময় দুনিয়াকে বলবে যে ইনসাফ কি জিনিষ এবং শক্তি থাকা সত্বেও অন্যান্যদের আবেগের মূল্য দিবে। এবং নিজের আবেগকে কন্ট্রোল করবে যে, আবেগ কি জিনিষ। আজকাল পাকিস্তানে বিশেষ করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিরোধিতার চেষ্টা হচ্ছে যেন আহমদীরা উত্তেজিত হয়।এবং তাদের খুবই ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে চক্রান্ত করা হচ্ছে কাজেই খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে এই সকল অবস্থার প্রতিরোধ করুন এবং ধৈর্য্য ও দোয়ার সাথে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সাহায্য চেয়ে এই অবস্থার প্রতিরোধ করুন।

রহমান খোদার বান্দার এতায়াত করে

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন যে, রাহমানের প্রকৃত পূজারী সেই সকল ব্যাক্তি যারা পৃথিবীতে নম্রতার সাথে চলে আর যখন খুশি তখন লোকদের সাথে চরম শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করে তখন শান্তি এবং রহমতের বাক্যে তাদের হেফাযত করে। আমাদের সম্পর্ক হল চরম মূর্খ লোকদের সাথে। আর এজন্য অনেক বেশি নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রন করে শান্তি এবং রহমতের পদ্ধতিকে অবলম্বন করতে হবে এবং প্রকাশ করতে হবে।

তিনি রহমতের শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন অর্থ্যাৎ কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতা আর গালির পরিবর্তে দোয়া দেয়। আর রহমান খোদার গুনাবলীকে ধারন করে। আর রহমান পুন্যবান এবং পাপীর মধ্যে পার্থক্য করা ছাড়াই তিনি তার সব বান্দাদের মধ্যে চাঁদ, সূর্য, আকাশ, পৃথিবীর অগনিত নেয়ামত থেকে কল্যাণ পৌঁছিয়ে থাকেন। সুতরাং এই আয়াতগুলোতে খোদা তাআলা ভালভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই অর্থেই রহমান শব্দ খোদা তাআলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তার রহমত বিস্তৃত রহমত। সাধারন ভাবে তাঁর বিস্তৃত রহমত প্রত্যেক ভালমন্দকে আচ্ছাদন করে রেখেছেন। সুতরাং আজও এবং ভবিষ্যতেও আমরা প্রত্যেক ভালমন্দকে বন্ধু শত্রুকে আল্লাহ তাআলার রহমতের পাত্র বানানোর চেষ্টা করে রহমতের ব্যবহার করে যাব,উপেক্ষা করার ব্যবহার করে যাব। আর দোয়ার মাধ্যমে নিজের জন্য সাহায্য যাচনা করবো আর অন্যদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাইবো যেন আমরা সর্বদা রহমান খোদার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত থাকি। ইবাদুর রহমানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, **ইয়াবিতুনা লি রাব্বিহিম সুজ্জাদাও ওয়া কিয়ামাও** অর্থাৎ তার প্রভূর জন্য তারা তাদের রাতগুলো সিজদাবনত ও দাড়ানো অবস্থায় অতিবাহিত করে। বিগত দিনগুলোতে অনেক বড় সংখ্যক লোক এভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এটি বলেননি যে, ইবাদুর রহমান গুটি কয়েক দিন (এভাবে) অতিবাহিত করে বরং স্থায়ীভাবে তারা তাদের রাতসমূহ সিজদাবনত ও (নামাযে) দাড়ানো অবস্থায় অতিবাহিত করে। কাজেই একজন আহমদীর জন্য এটি একটি অনেক বড় দায়িত্ব। বিশেষ করে এ অবস্থায় যখন কিনা পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশেসমূহে সমস্যা ও বিপদাবলীর যুগ চলছে/অতিবাহিত হচ্ছে। আহমদীরা যেন শুধুমাত্র ফরয নামায পড়েই ক্ষান্ত না হয় বরং তাদের রাতগুলোকে যেন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সাজায় এবং তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন রাতে উঠা অর্থ নফসকে(প্রবৃত্তিকে) পদদলিত করা। আমরা যদি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তাআলার জন্য রাতে ইবাদতকারী হই তবে এ জিনিসই জামাতের সমস্যাসমূহ দূর করার কারণ হবে। অতএব এটি স্মরণ রাখতে হবে যে রাতে উঠা যেন কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থে না হয় বরং (এ রাত জাগা যেন) আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ এবং জামাতী উন্নতির মানসে দোয়ার জন্য হয়। পৃথিবীর সব আহমদী যদি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় জামাতী উন্নতির জন্য রাতের বেলায় কমপক্ষে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার বিষয়টি নিজের ওপর অত্যাবশ্যকীয় করে নেয় তবে ইন-শা-আল্লাহ্ তাআলা আপনারা দেখবেন কিভাবে আমরা পূর্বাপেক্ষা আরো বেশি আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য প্রাপ্ত হই এবং শত্রুদের শত্রুতা ও বিরোধিদের বিরোধিতাকে কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা ধুলিস্মাৎ করে দেন। মহানবী (সা.) এও বলেছেন যে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, নফলের মাধ্যমে মানুষ আমার এত নিকটবর্তী হয়ে যায় যেন আমি তার কান হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে শুনে থাকে, তার চোখ হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে (কোন কিছু) ধরে থাকে এবং তার পা হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে চলাচল করে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা নফল নামায আদায়কারী ও তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীদের এতোটা নিকটবর্তী হয়ে যান। এটি আমাদের দায়িত্ব আমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার এ নৈকট্য লাভের চেষ্টা করি।

রমযান চলে যাওয়া অর্থ এটা নয়-আবার সেভাবেই রাতকে যেন নষ্ট করা হয় আর অনেক রাত পর্যন্ত্ম বৃথা সভা করা হবে আর ফযরে নামাযের জন্য উঠা কষ্ট হবে। নয়, বরং ঐ রাতকে অর্জনের চেষ্টা করুন যা আল্লাহ তাআলাকে নিকটে নিয়ে আসবে আর আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য দানকারী হবে।রমযান যা আমাদেরকে রহমান খোদার বান্দা হবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে এর উপর আমল করে আমাদের কাজ হলো-নিজেদের রাতগুলোকে ইবাদতের মাধ্যমে জীবিত রাখা। যেভাবে আমি বলেছি-ইনশাআল্লাহ' এটাই ঐ জিনিস যা আমাদের সপক্ষে দ্রূত বিজয় নিয়ে আসবে।মহা নবী (সা.) এর সাহাবীরা এর হক আদায় করেছেন আর জগৎ দেখেছে তারা কি বিপস্নব সৃষ্টি করেছেন। দিনের বেলা তাদের বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হতো কিন্তু তাই বলে রাতের বেলা তারা আরাম করতেন না। বরং তারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে রাতে ইবাদতের এ রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের উন্নতি অব্যাহত ছিল।

আজ এটা আহমদীদের দায়িত্ব তারা যেন এটা বাস্তাবায়ন করে আর আহমদীয়াত এবং ইসলামের উন্নতির জন্য অনেক বেশি দোয়া করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-রসূল (সা.) এর আগমন কালে আরব ও বিশ্বের কি অবস্থা ছিল এটা কারো অজানা নয়। তারা সম্পূর্ণ বন্য/অসভ্য লোক ছিল। পানাহার ছাড়া আর কিছুই জানাতো না। না তাদের বান্দার অধিকার সম্পর্কে পরিচিতি ছিল আর না আল্লাহর

প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদনের অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং খোদা তাআলা একদিকে তাদের চিত্র প্রকাশ করে বলেন- ইয়াকুলুনা কামা তায়কুলুনা অর্থাৎ যেভাবে জীবজন্তু খেত সেভাবে তারা খেত। অপর দিকে রসূল (সা.) এর ঐশী আহবান তাদের উপর এমন প্রভাব ফেললো-ইয়াবুতুনা লিরাব্বিহিম সুজ্জাদাও ওয়া কিয়ামা এর অবস্থা হয়ে গেল। অর্থাৎ নিজের প্রভুর স্মরণে রাতগুলো সেজদা ও দাড়ানো অবস্থায় অতিবাহিত করে দিত। হায় আল্লাহ! কী মহান আশীষ। রসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষার ফলশ্রুতিতে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত ও বিপব সৃষ্টি হলো। আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন ও বান্দার অধিকার আদায় দুটি ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আর মৃত ভঙ্গাক ও মৃত জাতিকে এক জীবিত উন্নতর চারিত্রিক গুনাবলী সম্পন্ন জীবিত ও পুতপবিত্র জাতিতে পরিণত করে দিলেন। অনুপম বৈশিষ্ট্য দুটি হয়ে থাকে। প্রথমত: জ্ঞান ,দ্বিতীয়ত: ব্যবহারিক কর্ম । কর্মের অবস্থার দৃষ্টান্ত তো এমন ছিল ইয়াবুতুনা লিরাব্বিহিম সুজ্জাদাঁও ওয়া কিয়ামা আর জ্ঞানের অবস্থা এমন ছিল- এতো অধিক প্রকাশনা ও ভাষা শৈলিতার সেবা প্রবাহমান ছিল যার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

তিনি (আ.) আরও বলেন- আধ্যাত্মিকতা পবিত্রতা ছাড়া কোন ধর্ম চলতে পারে না। কুরআন মহানবী (সা.) এবং আগমনের পূর্বে জগতের অবস্থা কি ছিল তা বর্ণনা করেছে। ইয়াকুলুনা কামাতায়কুলুনা- আর যখন এই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো তখন তারা হয়ে গেল ইয়াবুতুনা লিরাব্বিহিম সুজ্জাদাও ওয়া কিয়ামা। যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ থেকে ব্যবস্থাপত্র না পাওয়া যায় ততক্ষণ হৃদয় সঠিক থাকে না। মানুষ পা সামনে রাখে কিন্তু সে পিছনে পরে যায়। পবিত্র গুনাবলী ও ঐশী শক্তি সম্পন্ন মানুষ থাকলে ধর্ম চলতে পারে। এটা ছাড়া কোন ধর্ম উন্নতি করতে পারে না। করলেও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পাওে না। সুতরাং আমরা যারা এ অভিপ্রায় রাখি, জামাতের দ্রুত উন্নতি হোক, জামাতের সদস্যদেরকে যে সমস্যাবলী ও বিপদাবলী সম্মোখীন হতে হচ্ছে তা দ্রুত শেষ হোক, তাহলে যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যেভাবে ঐশী ব্যবস্থাপত্র লাভের প্রয়োজন। আর ঐশী ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায় আলাহ তালার সমীপে তাঁর প্রদত্ত হেদায়ত/ পথনির্দেশনা অনুযায়ী উপস্থিত হয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে। আলাহ তাআলা আমাদের এর সৌভাগ্য দিন।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এটা বর্ণনা করেছেন- ইবাদুর রহমান খোদা তাআলার নিকট জাহান্নাম দূরীভূত হওয়ার দোয়া করে আর জাহান্নাম দ্বারা দুই জাহান্নামই বুঝায়।

পরকালের জাহান্নামও যা গুনাহর ফলশ্রুতিতে পাবে। আর এই জগতের জাহান্নামও যা বিভিন্ন মন্দ কাজ বা ভুলের মন্দ পরিনামের ফলশ্রুতি পাওয়া যায়।

অতএব ইবাদুর রহমান/ আল্লাহ্রই ইবাদত কারী বান্দার কাজ হলো সর্বদা তওবা ও ইস্তোগফার করে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা আশ্রয় থাকার চেষ্টা করা। আর আল্লাহ তাআলা নিকট দোয়া করা।

এ দোয়া করুন তিনি যেন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্চনা থেকে বাচিঁয়ে দেন। আর প্রত্যেক ধরনের ইহলৌকিক বিপদাবলীর জাহান্নাম থেকে যেন বাঁচান। জগতের চাকচিক্য,আকর্ষণ ও একে প্রাধান্য দেয়া যেন তোমাদেরকে জগতের গোলাম বানিয়ে না দেয়। এ গুলো এ দুনিয়াতে খোদা তাআলা থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে পরকালের জাহান্নামের পাত্র বানায়। আর সন্তান সন্ততির পক্ষ থেকে আমাদের যে দুশ্চিন্তা তাও যেন দূর হয়। যার কারনে আমাদের অভ্যন্তরে অস্থিরতার আগুন জ্বলে।

রহমান খোদার ইবাদতকারীর পঞ্চম বৈশিষ্ট্য এটা বর্ণনা করা হয়েছে-লাম উইসরিফু অপব্যায় করে না। বৃথা খরচ করে না। তারা না ব্যক্তিগত সম্পদ লোক দেখানোর জন্য খরচ করে আর না জামাতের সম্পদ চিন্তাভাবনা ছাড়া খরচ করে।

ব্যক্তিগত বৃথা খরচের একটা উদাহরণ আমাদের এখানে খুব ব্যাপক হচ্ছে। আর তা হলো বিয়ে শাদীতে অথবা খরচ। একে অন্যের দেখাদেখি এখানে কয়েক ধরনের খাবার রান্না করে। আর পাকিস্তানেও। বিয়ের দাওয়াত হয়। পরে ওলীমার দাওয়াত হয়।

এরপর বিয়ের আগে মেহেদী লাগানোর দাওয়াত এর এক প্রচলন শুরু হয়েছে। এতেও প্রচুর খরচ করা হয়। আর মেয়ের পক্ষের লোকেরা যারা বিয়ের সাজসজ্জা বাড়াতে চায় তারা এ জন্যও নিমন্ত্রণ কার্ড ছাপায় ও বন্টন করে। মেহেদী লাগাতে হলে মেয়েরা যারা কনের বান্ধবী তারা একত্রিত হয়ে লাগিয়ে নিক। কিন্তু এতেও দিন দিন অপচয় হয়ে চলেছে। আর শুধু দেখাদেখি তা করা হচ্ছে। আর নতুন রীতি এটা সৃষ্টি হয়েছে ছেলেপক্ষও বিয়ের পূর্বে সাজসজ্জার নামে মেহেদী লাগানোর দাওয়াত দেয়া শুরু করেছে। আমি দেখছি এই ভুল রীতিনীতিতে ধর্মের খুব ভাল জ্ঞান রাখেন এমন লোকও শামিল হচ্ছেন। আর কেউ যদি এত বেশি বেশি দাওয়াত কোন কারণে না করেন,, আমাদের কারণ এটাই মনে করা উচিত কোন নেকির কারনে, তাহলে তাদের ব্যাপারেও কথাবার্তা বলা হয়। এ কৃপন, এ অমুক তমুক। বিশেষ ভাবে বিদেশ থেকে যারা পাকিস্তানের যায় তারা তো অলংকারাদী, পোশাকাদীতে বেহিসাব খরচ করে। প্রত্যেক পদে পদে খরচ করে। এসব অপচয়। যেভাবে

আমি প্রথমে বলেছি যদি এভাবে সংযম করার অভ্যাস হয় তাহলে এগুলো গরীবের কাজে আসতে পারে। গরীবদের বিয়েতে কাজে আসতে পারে। । এতীমদের লালন পালনের কাজে লাগতে পারে। আর অন্যান্য নেকির কাজে খরচ করা যেতে পারে। । আসলে এটাই ঐ জিনিস যা মানুষকে রহমান খোদার ইবাদতকারী বানায়।

আর ৬ষ্ঠ বিষয় এটা বর্ণনা করা হয়েছে লাম ইয়াখতারু কৃপনতা না করা। আর কৃপনতা করে যেখানে আবশ্যকীয় খরচের প্রয়োজন সেখানে অনেক লোক খরচ করে না। কৃপনতার চূড়ান্ত প্রকাশ করে। আর এসব কিছু এ জন্য করে যে, যেন সম্পদ বেড়ে চলে। কোন কোন লোকের কৃপনতা এতটুকু হয় যে, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও খরচ করে না। না নিজের আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করে, না গরীবদের জন্য কিছু দেয়, না জামাতের জন্য কুরবানী করে।

সুতরাং যে সামর্থ্যবান এবং সম্পদ থাকার পরও খরচ করে না সে-ও রহমান খোদার ইবাদতকারী রূপে গন্য হবে না।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যেখানে অপব্যয়কারীদের অপছন্দ করেছেন আর ইবাদুর রহমান হওয়া থেকে তাদের বঞ্চিত রেখেছেন, সেখানে কৃপণতাকারীদেরও অত্যন্ত অপছন্দ করেছেন। প্রথমত: সে যথাযথ ক্ষেত্রে খরচ করে না। দ্বিতীয়ত: সে আটকে রেখে সম্পদ জমা করে সমাজের উন্নতির পথেও অন্তরায় সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইবাদুর রহমান সীমাতিরিক্ত খরচ করবে না, লোক দেখানোর জন্যও খরচ করবে না আর এত কৃপনতাও করবে না যে প্রয়োজনীয় খরচ করতে দ্বিধা করবে বরং এ দু'টির মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

আর ইবাদুর রহমানের খরচ করা ও খরচ থেকে বিরত থাকাও কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।ইবাদুর রহমানের চিহ্ন হিসেবে এটাও বর্ণনা করেছেন, সে শিরকের নিকটেও যাবেনা। এটি খোদা তাআলার নিকট সবচেয়ে বড় অপরাধ। আলাহ তাআলা বলেছেন, শিরক ব্যতিরেকে সকল গুনাহ ক্ষমা হতে পারে।

ইবাদুর রহমান শিরক মুক্ত থাকবে বলতে শুধু বাহ্যিক শিরক বুঝানো হয় নি, যেমন মূর্তি পূজা ইত্যাদি। বরং গোপন শিরক থেকেও সে বেঁচে চলে। তার ইবাদত সমূহ ও অন্যান্য বিধি-বিধান পালন করা আল্লাহ তাআলার নির্দেশনুযায়ী হয়ে থাকে। সে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখে যে, তার কোন আচরণ এবং কোন কাজ যেন গোপন শিরক হিসেবে গন্য না হয়। এ ব্যাপারে সে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে। কোন কাজকর্ম তাদের ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

বিগত খুতবায় আমি যেভাবে বর্ণনা করেছিলাম, এটাও এক ধরনের গোপন শিরক। ইবাদুর রহমান হওয়ার অষ্টম শর্ত হল, সে কোন সৃষ্টজীবকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে না। যদিও মহানবী (সা.), সাহাবাগণ, খোলাফায়ে রাশেদীনগণ ও পরবর্তী মুসলমানগণ তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করেছেন আর তা ছিল কেবল শত্রুদের বাড়াবাড়ি ও সীমাতিক্রমের কারণে এবং তাদের নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য। মহানবী (সা.) ও সাহাবাগণ চেষ্টা করেছেন এবং নির্দেশও দিয়েছেন, কোন বাচ্চা, নারী, নেতা, পাদ্রী, ধর্ম জাযক, সন্ন্যাসী এবং যারা যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত নয় (এমন লোকদের) হত্যা করো না। এর বিপরীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি, লক্ষ লক্ষ নিস্পাপ জাপনীদের হত্যা করা হয়েছে। আজও শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে বিমান হামলা করে নিস্পাপ লোকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়।এতো হচ্ছে ইসলাম বিরোধীদের অবস্থা। কিন্তু যারা নিজেদের ধারনায় নিজেদেরকে ইবাদুর রহমান বলে বিশ্বাস করে তারাও আত্মঘাতী হামলা করে নিস্পাপ লোকদের হত্যা করছে। এটাও আরেক বেদনাদায়ক ও ভয়ানক অবস্থা যে ধর্মের নামে নরহত্যা চলছে। সুতরাং এমন লোকেরা কখনোই ইবাদুর রহমান হতে পারে না।

ইবাদুর রহমানের নবম বৈশিষ্ট্য, সে ব্যভিচার করে না। প্রকৃত ব্যভিচারও এর অন্তর্ভূক্ত আর নোংরা বেহুদা অনুষ্ঠান ও দৃশ্য দেখে আনন্দ লাভ করাও এর অন্তর্ভূক্ত। আজকাল ইন্টারনেট ও টিভি চ্যানেল সমূহের অবাধে কিছু অনুষ্ঠান দেখা হয় যেগুলো মানুষিক ও চোখের ব্যাভিচার অন্তর্ভূক্ত। আহমদীদেরকে এগুলো থেকেও বিশেষভাবে বেঁচে চলা উচিত। দশম বৈশিষ্ট হচ্ছে, ইবাদুর রহমান কখনো মিথ্যা বলে না, মিথ্যা সাক্ষ্যও দেয় না। জাতির পদস্খলন ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বিশেষ ভূমিকা রাখে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বান্দা ও ঐশী জামাতকে তো উন্নতির দিকে যেতে হবে। তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা এই অঙ্গিকার করেছেন, তারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করবে আর ক্রমান্নয়ে উর্দ্ধে ধাবিত হতে থাকবে। তারা যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে তারা আল্লাহ তাআলার সেই বিশেষ বান্দা বলে গন্য হবে না,যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ বর্ষণ করেন বা যাদের সাথে অনুগ্রহ করার অঙ্গিকার করেছেন। সুতরাং আহমদীদেরকে নিজেদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিষয়েও যখন তাদের নিকট জানকে চাওয়া হয়,তখন শত ভাগ সত্য কথা বলা উচিত। যেমন পারিবারিক বিষয়াবলীতে, উপমা স্বরুপ বিবাহের সময় এই সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনের অঙ্গীকার করা হয়ে থাকে যে, আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব যাতে কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ থাকবে না।

পরবর্তীতে ঘুরিয়ে যার অন্য কোন অর্থ করা হবে না। কিন্তু বিবাহের পরে মেয়ে ছেলের সাথে মিথ্যা বলে আর ছেলে মেয়ের সাথে মিথ্যা বলে। দুজনের শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা পরস্পর মিথ্যা বলে। আর দুজনের মধ্যে দ্বন্দ শুরু হয়, আর ধীরে ধীরে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। কেবল মাত্র ব্যক্তিগত অহমিকা ও কামনা বাসনা চরিতার্থের জন্য অনেক ঘর ভেঙ্গে যায়। বাচ্চা হওয়ার পরও ঘর ভেঙ্গে যায়। পূর্বেও কয়েকবার এ সম্পর্কে আমি বলেছি। সুতরাং আলাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার জন্য এক মোমেন বান্দার আবশ্যক, সকল ধরনের মিথ্যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা, যা তাদেরকে ইবাদুর রহমানদের অন্তভূর্ক্ত করবে। অত:পর এগারতম বৈশিষ্ট্য,"ইযা মাররু বিলাগবে মাররু কেরামা" অর্থাৎ পার্থিব আনন্দ ফূর্তিতে প্রভাবিত হয়ে তাতে অংশগ্রহন করে না। এ যুগের বৃথা কাজ, যেভাবে পূর্বে উলে-খ করে এসেছি, ইন্টানেটও এর অন্তভূর্ক্ত, এটি নোংরা প্রোগ্রামসমূহে ভরপুর করা হয়েছে। টিভি চ্যানেল সমূহও অনুরূপ।

এছাড়া আজকাল স্কুল কলেজগামী ছেলে মেয়েরা গ্রুপ বানিয়ে পড়াশুনা করে, ক্লাবে যায়, একত্রে ডান্স করে, এরপর এগুলো ধারণ করে প্রোগ্রাম বানানো হয়। কনসার্টের জন্য প্রোগ্রাম বানানো হয়। এক মোমেনের জন্য এসব কিছুই বৃথা কাজ। একদিকে আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার অঙ্গিকার করি আর ইবাদুর রহমান হওয়ারও অঙ্গীককার করি, অতঃপর এসকল বৃথা কর্মে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত যা সরাসরি চরিত্র ধ্বংশ করে । সুতরাং সত্যিকার আহমদীদের এথেকে বেঁচে চলা প্রয়োজন। এছাড়া বৃথা কর্মসমূহের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও অন্তভূর্ক্ত, যা পূর্বে উলেখ করে এসেছি। সুতরাং যে কোন বিষয়, যা সমাজের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্টের কারন,এগুলো সবই বৃথা কাজ।

হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "ওয়া ইযা মাররু বিলাগবে মাররু কিরামা" যখন তারা কোথাও কোন বৃথা কথা শোনে যা কোন যুদ্ধ বা ঝগড়া বিবাদের পূর্বাভাস, তবে তারা বুজুর্গ সুলভ ভাবে এড়িয়ে চলে যায়। আর সামান্য সামান্য বিষয়ে ঝগড়া শুরু করে না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ বিশেষ কোন কষ্ট না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঝগড়া বিবাদ করা অপছন্দ করে। শান্তিময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত রাখার উপায় এটাই , ছোট ছোট বিষয় উপেক্ষা করা, ক্ষমা করা।

এ আয়াতে যে "লগব" শব্দ ব্যবহার হয়েছে এর অর্থ এমন আচরণ, উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি দুষ্টামী করে এমন বাজে কথা বলে বা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এমন কোন কাজ করে, যদ্বারা বাস্তাবিক ভাবে কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক এমন কথা বার্তা ও কাজ কর্ম উপেক্ষা করা আর বুজুর্গ সুলভ আচরণ করে এড়িয়ে যাওয়া।

আর কেবল এটাই না বরং ধীরে ধীরে জামাত থেকেও সরে পড়ে। আর তের তম বৈশিষ্ঠ হল, সে নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য এই দোয়া করে যে তাদের মাঝে তাদের চোখের স্নিগ্ধতা রাখ সুতরাং পরবর্তী বংশধরদের স্থায়ীত্বের জন্য এটি নিশ্চিত জরুরী ব্যবস্থাপত্র। যেখানে বাহ্যিক চেষ্টা প্রচেষ্টা করা হচ্ছে সে তার নিজ সন্তানের আধ্যাতিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য সেখানে দোয়াও করতে হবে। কেননা প্রকৃত সত্তা তো খোদা তালার যিনি উত্তম পরিনাম সৃষ্টি করেন। যদি কেউ এরুপ মনে করে,.....নিজ সন্তানের তরবিয়ত করছে তবে এমনটি ভাবা ভুল। এ সকল লোক যারা জগত মুখী যদি নিজ সন্তানের উন্নতি দেখে তবে এ উন্নতি আল্লাহ তালার রহমানিয়্যাতের.... নিঃসন্দেহে তাদেরকে কল্যান পৌছাচ্ছে... আর এটা কেবল জাগতিক বিষয়ের উন্নতি কিন্তু তাদেরকে রহমান খোদার বান্দা বলা যায় না। কেননা আল্লাহ তাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম হবার সম্মান প্রদান করেন নাই। আর মুত্তাকীদের ইমাম হবার কারনে নিজ তাকওয়ার দিকে ধাবমান হবার দিকে তাদের দৃষ্টি যায় নাই। কিন্তু যে নিজ সন্তানের জন্য তাকওয়াতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার দোয়া করবে সে কেবল জাগতিক উন্নতি যাচনা করবেনা বরং ধর্মীয় ও আধ্যাতিক উন্নতিও যাচনা করবে। আর নিজেও তাকওয়াতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ তালার নেয়ামত সমূহ অর্জন কারীতে পরিনত হবে। আজ-কাল দুনিয়ার সকল স্থানে সমাজে সন্তানদের তালিম এবং জাগতিক উন্নতির জন্য পিতা মাতা খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকেন কিন্তু আধ্যতিকতার দিকে খুবই কম মনোযোগী। এক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বে স্বাধীনতার নামে এখন সন্তানদেরকে এমন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে তারা পিতা মাতার উপদেশ শুনতে অনাগ্রহী হচ্ছে। আর এখন এ সকল লোকদের বোধদয় হচ্ছে, টিভিতে প্রগ্রাম আসাও শুরু হয়েছে, এটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যাধিক স্বাধীনতা যা সন্তানদেরকে দেয়া হচ্ছে। পিতা মাতা সন্তানের ....হবে এখন সন্তানরা পিতা মাতার সামনে দন্ডায়মান হয়ে যাচ্ছে। অনেক এমন মামলা আছে যেখানে সন্তানরা পিতা মাতাকে প্রহার করা শুরু করে দিয়েছে। সামান্য .... সন্তানরা সহ্য করেনা।.কেউ .... সহ্য করেনা। আমি পূর্বেও বলেছি , এ আওয়াজ ওঠা শুরু হয়েছে , পরবর্তী বংশধরকে যদি সামাল দিতে হয় তাহলে এর কোন সীমা যেন নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ কতদূর পিতা মাতা সহ্য করবে এবং কখন নিজ সন্তানকে শাস্তি প্রদান করবে। কেননা যখন পিতা মাতা .... শাস্তি প্রদান করে তো এখানে সন্তানদের সুরক্ষার জন্য এখানে যে এদারা বানানো হয়েছে,

পশ্চিমা বিশ্বে তারা বাচ্চাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়, সন্তানরা পিতা মাতাকে শাষায় যে আমাদেরকে কিছু বল্লে আমরা সেখানে চলে যাব। আর এ বিষয়টি সন্তানদেরকে সীমাতিরিক্ত .... করে দিয়েছে। অনেক বংশ এমন যাদের সন্তানদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। সুতরাং এর একটি বড় কারন এটি যে দোয়ার ঘর শূন্য। তাই বলেছেন যাচনা কর আল্লাহ তালার কাছে যেন বাচ্চাদের সঠিক তরবিয়ত হয়। আর এর সাথে সাথে নিজেদের কিছু উপমাও সৃষ্টি কর।

হযরত মসীহ মাওউদ আঃ বলেন আরও একটি কথা , লোকেরাতো খুবই সন্তান কামনা করে আর সন্তান হয়েও থাকে কিন্তু কখনো এটা দেখা হয় নাই যে সন্তানদের তরবিয়ত আর তাদের কে নেক এবং উত্তম চলন তৈরি করা আল্লাহ তালার .... বানানোর .... কখনো তাদের জন্য দোয়া করেনা আর না-ই তাদের তরবিয়তের বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখে। তরবিয়তের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কিভাবে করতে হবে, কোন বয়সে কি ধরনের তরবিয়ত করা দরকার। কোন বয়স থেকে বাচ্চাদেরকে সামলে রাখতে হবে এদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। বলেন আমার অবস্থাতো এরুপ, আমার এমন কোন নামাজ নেই যে নামাজে আমি আমার বন্ধু , আর সন্তান , এবং স্ত্রীর জন্য দোয়া করিনা। অনেক পিতা মাতা এমন আছেন যারা নিজ সন্তানকে মন্দ অভ্যাস শিখিয়ে থাকে,শুরুতে যখন তারা মন্দ কর্ম করা শিখতে থাকে তো তাদেরকে তিরষ্কার করেনা। পরিনামে তারা দিনে দিনে সাহসী এবং অবাধ্য হতে থাকে। লোকেরাতো সন্তানের আকাঙ্খা করেই থাকে, কিন্তু তা এ উদ্দেশ্যে নয় যে তারা ধর্মের সেবক হবে, বরং এজন্য যে পৃথিবীতে তাদের কোন ওয়ারেস যেন হয়। আর যখন সন্তান লাভ করে তখন তার তরবিয়তের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয় না। তার চাল চলন সংশোধনও করা হয়না। সন্তানদেরকে শেখানোও হয়না। কেউ আমাকে বলেছেন , স্কুলে কোন ছেলে বা মেয়েকে অন্য মুসলমান বলে দিয়েছে, তোমরাতো সয়তানের ইবাদত কর। তোমরাতো খোদাকে মাননা। বাচ্চারা জানতোইনা তাদেরকে কি জবাব দিতে হবে। তাই চুপ করে থাকলো। তার এই নিরবতার কারনে অন্যান্য বাচ্চারা ভেবে নিবে আহমদীরা খোদাকে মানেনা। এই বুনিয়াদি বিষয়টি অনেকে নিজ সন্তানদেরকে বলেনা। বলেন আর তার চারিত্রিক অবস্থারও সংশোধন করা হয় না। শৈশব থেকে চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করলে তুই বলাতো দূরের কথা পিতা মাতার সামনে সন্তান কখনো দাড়াতেই পারেনা। আগেও আমি একবার বলেছি মেয়েদের পোশাক রয়েছে। চার পাঁচ বছর বয়স থেকেই পোশাকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করলে বড় হলে তাদের মাঝে এ অনুভুতি সৃষ্টি হবে। তের চৌদ্দ বছর বয়সে বলুন...... তাহলে সন্তান প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এজন্য বলা হয়েছে চারিত্রিক অবস্থা সংশোধন করা হয়না। বাল্যকাল থেকে এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। স্বরণ রাখবে সে ব্যক্তির ইমান সঠিক হতে পারেনা যে নিকট সম্পর্ক না বোঝে। যখন সে এর থেকে.... তার কাছ থেকে অন্যান্য কোন নেকীর আশা করা যেতে পারে। নিকট সম্পর্কীয়দের ব্যাপারে যার দৃষ্টি নেই তাহলে বাকী নেকী কিভাবে আসবে। আল্লাহ তালা সন্তানের আকাঙ্খা এভাবে পূর্ণ হওয়া বর্ণনা করেছেন,

রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযেনা ওয়া যুররিয়াতেনা কুররাতা আয়ুনিন ওয়ায আলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা।

হে আল্লাহ তুমি আমাদের স্ত্রী সন্তানের মাধ্যমে আমাদের চোখের স্নিগ্ধতা দান কর। আর এটি তখনি সম্ভব হবে যখন অবাধ্যতা এবং অপরাধের জীবন অতিবাহিত করবেনা। বরং ইবাদুর রহমানের জীবন যাপনকারী হবে। আর আল্লাহকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য প্রদানকারী হবে। আর এর সামনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন

ওয়াযআলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা। সুতরাং সন্তান যদি নেক আর মুত্তাকী হয় তবে সে তাদের ইমাম-ই হবে। এখানে মুত্তাকী হবার দোয়া রয়েছে অথাৎ নিজের মুত্তাকী হবার দোয়া এখানে রয়েছে। সুতরাং সন্তানদের তরবিয়তের জন্য মুত্তাকী হওয়া এবং ইবাদুর রহমান হওয় শর্ত যুক্ত। যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ আঃ বলেন, নিজের মুত্তাকী হবার জন্য দোয়া এবং চেষ্টা প্রচেষ্টা করা জরুরী। এর পর যখন আমরা নিজেরা মুত্তাকী হবার জন্য চেষ্টা করব তখন ঐসকল বৈশিষ্ঠেরও অধিকারী হব যা আল্লাহ তালা ইবাদুর রহমানের জন্য বর্ণনা করেছেন। আর এবিষয়টি-ই আল্লাহ তালার নৈকট্য প্রদানকারী হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থলে বলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী ভক্তির যোগ্য, তাকে আল্লাহ তালা সুরক্ষা করেন, আর এরা ঐ সকল লোক হয়ে থাকে যারা আল্লাহ তালার সাথে নিজেদের সত্যিকার সম্পর্ক রাখে আর নিজেদের অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন রাখে। আর.... মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করে। আর খোদা তালার প্রতি সত্যিকার ইমান আনয়নকারী। সত্যিকার আহমদীদের এ বৈশিষ্ঠ থাকা উচিত। আল্লাহ তালা]আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, যেন তার সাথে আমাদের সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর আমাদের অভ্যন্তর সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকে। আর আমরা ঐসকল বৈশিষ্টের অধিকারী যেন হই যা ইবাদুর রহমান হবার জন্য আবশ্যকীয়। আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার চীরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী করুন। আমীন।

[জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত]

কলেমা

আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

যে পবিত্র ও সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে ইসলামী আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করা হয় একে ইসলামী পরিভাষায় কলেমা বা একটু বড় করে বললে কলেমা তাইয়্যেবাহ অর্থাৎ পবিত্র বাক্য বলা হয়।

কেউ কেউ অনেক সময় জানতে চান, এ কলেমা কি কুরআনে আছে? এর উত্তর হলো কুরআনে এভাবে নেই বটে তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' বাক্যগুলো অনেক বার ব্যবহৃত হয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঐশী ইঙ্গিতে এ দুটো পবিত্র কথাকে সংযুক্ত করে একজন মু'মিন মুসলমান জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন শাহাদাতি আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি ওয়া ইক্বামিস সালাতা ওয়া ই'তাইয যাকাতা ওয়াল হাজ্জি ওয়া সাওমি রামাযানা হযরত ইবনে উমর (রা. আনহুমা) বর্ণিত এবং বুখারী কর্তৃক সংকলিত।

এর অর্থ হচ্ছে–হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, (১) সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযান মাসের রোযা রাখা।

সুতরাং প্রথম বিষয়টি হলো **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এটাই হলো কলেমা। এটাই একজন মু'মিনের জীবনের MOTO একজন মুসলমানকে একথার সাক্ষ্য দিতে হয়–মৌখিকভাবে, অন্তরে বিশ্বাস রেখে এবং বাহ্যিক ও ব্যবহারিক কার্যের মাধ্যমে। কলেমার প্রথম অংশে আল্লাহকে ইলাহ তথা ভয় ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটাই তৌহিদ বা একত্ববাদের মূল কথা। কেননা, সত্যিকারের ইলাহ বা উপাস্য একজনই হতে পারেন। এর বাস্তব ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিয়ে গেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। যেভাবে তিনি (সা.) আল্লাহ্র এবাদত করে দেখিয়ে গেছেন আমরাও যদি সেভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করি তবেই আমাদের পাঠ সার্থক হবে।

ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম তাই এর কলেমা আছে। অন্য কোন ধর্মের কলেমা নেই। আমাদের নবী নবীদের সেরা বিশ্ব নবী পরিপূর্ণ নবী খাতামান্নাবীঈন। তাই তাঁর নামই কেবল কলেমার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। আর কোন নাম যুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। যদিও কেউ কেউ দোয়া-গঞ্জল আরশ প্রভৃতির নামে অন্যান্য নবীদের নামের সাথে যুক্ত করার কলেমা বানানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু এর প্রামাণিক ভিত্তি নেই। একজনের অভ্যন্তরীণ বিষয় তার কর্মের মাঝে ফুটে ওঠে। তাই কলেমা কেবল মুখে আওড়ালে হবে না বরং অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে এর বিকাস ঘটাতে হয়। কলেমা তাইয়্যেবাহ বা পবিত্র বাক্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের সূরা ইবরাহীমের ২৫ আয়াতে বর্ণনা করেছেন একটি তুলনার মাধ্যমে। এটা আমাদের জীবনে আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করতে পারে বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি।

আমাদের কলেমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এটাই আমাদের জীবন। একে সমুন্নত রাখার জন্যে আমরা আমাদের শেষ রক্ত বিন্দুও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা একদিকে বলে আমাদের কলেমা নাকি এটি নয় অন্যটি। অথচ পাকিস্তানে এ কলেমা পাঠের জন্যে আহমদীদের ওপর যে নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানো হয়েছে ইতিহাস এর সাক্ষ্য মৌলভীদের এ মিথ্যা প্রচারণা থেকে আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় চাই।

কলেমা প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়ে গেল। পাঠানদের আর কিছু না থাক ইসলামী জোস আছে পুরো মাত্রায়। একবার এক পাঠান একজন অমুসলমানকে ধরে তাকে বললো কলেমা পাঠ কর নইলে তোকে কতল করবো। বেচারা অমুসলমান প্রাণের ভয়ে পাঠানের কাছে বললো, আমাকে কলেমা শিখিয়ে দাও আমি পাঠ করবো। মজার কথা, পাঠান নিজেই কলেমা জানে না সে অন্যকে কি শিখাবে। তাই সে অমুসলিম লোকটাকে বললো, এ যাত্রা তোকে ছেড়ে দিলাম। আমি কলেমা শিখে নিই পরে তোকে মজা দেখাবো!

আমাদের অবস্থা যেন এই পাঠানের মত না হয়। আমরা কলেমা জানি অথচ উপলব্ধি করি না এবং তদনুযায়ী আমলও করি না। আল্লাহ্ এথেকে আমাদের রক্ষা করুন। পরিশেষে কলেমা প্রসঙ্গে আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এর একটি বক্তব্য উপস্থাপন করে এখনকার মত আলোচনার ইতি টানতে চাচ্ছি :

মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার ওপর ঈমান রাখি যে, খোদা তাআলা ব্যতীত কোন মাবূদ নাই এবং সাইয়্যেদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রাসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি যে, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম বেশী করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-ওপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মৃত্যুবরণ করে।"

(আইয়ামুস সুলেহ : পৃ: ৮৬-৮৭)

নেযামে নও
(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাযিআল্লাহু আনহু
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা

(৯ম কিস্তি)

প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ

একই ভাবে ইসলাম সম্পদশালী বিত্তবান ওই লোকদের জুলুমও রুখে দিয়েছে যারা কৌশলগত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে ধন সম্পদ পুঞ্জিভূত করে নেয়, তাদের জমাকৃত সেই অর্থ-সম্পদে ইসলাম বাকী দুনিয়ার অংশীদারিত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ না করলে তারা এতটা বিত্তশালী হতে পারতো না। অথচ তারা এখন অর্থের জোরে প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ, গ্যাস ও জ্বালানী নিজেদের করায়ত্ত করে নিচ্ছে আর এভাবে তারা অন্যের অধিকার হরনের কারণে পরিণত হচ্ছে। ইসলাম এর প্রতিবিধানে এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে খনির মালিক যে পরিমাণ খনিজ সম্পদই উত্তোলন করুক, আহরিত সেই প্রাকৃতিক সম্পদের এক পঞ্চমাংশের অংশীদারিত্ব রাষ্ট্রের।

আবার খনির মালিক তার খনিজ সম্পদ বাজার জাত করার পর উদ্বৃত্ত যে খনিজ সম্পদ বছর জুড়ে তার কাছে মজুদ হিসাবে থেকে যায় তার যাকাতও আদায় করতে হয় আর এভাবে রাষ্ট্র খনিজ সম্পদের মালিকানাস্বত্ত্বের অংশীদার হয়ে যায়। এতে গরীবদের জন্য যথেষ্ট অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়ে, যা থেকে গরীবদের হক্ব পূরণ করা যায়। এতে করে তেমন বিপদের উদ্ভব হয় না যা খনি খননের ফলে তথায় বসবাসকারীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে থাকে।

অপরের ধন-সম্পদ দেখা শুনা করার বাহানায় নিজেই তা আত্মসাৎ করার প্রতিকার ইসলামে রয়েছে

ইসলাম দ্বিতীয় প্রতিকার এটা করেছে যে, বিশ্বে এই ঘোষণা প্রদান করে দেয়–

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾

(আল হিজর ৬ষ্ঠ রুকূ আয়াত নং ৮৯)

লা তামুদ্দান্না আ'ইনাইকা ইলা মা মাত্তাঅ'না বিহী আয ওয়াজাম মিনহুম ওয়ালা তাহযানু আলাইহিম ওয়াখফিয জানাহাকা লিলমু'মিনিন। (১৫:৮৯)।

বর্ণিত হয়েছে-অন্যের ধন-সম্পদ এই বাহানায় তুমি নিওনা যে, আমি সে সব দেখা শোনা করব, **লা তামুদ্দান্না আ'ইনাইকা ইলা মা মাত্তাঅ'না বিহী আযওয়াজাম মিনহুম** যা কিছু ধন সম্পদ আমি লোকদের দিয়েছি সে সবের প্রতি বারে বারে চোখ তুলে লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখো না, **ওয়া লা তাহযান আলাইহিম** আর এ কথাও বলো না যে তাদের সেই অবস্থা দেখে বড়ই দু:খ হয়। নির্দেশ করা হয়েছে, এ দু:খ তোমরা নিজেদের কাছেই রেখে দাও- **ওয়াখফিয জানা হাকা লিলমু'মিনীন,** তোমাদের আত্মমর্যাদা রয়েছে তোমরা এর উন্নয়নে কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক পরিচর্যা যত চাও করে যাও, এতে কেউই তোমাদের বারণ করছে না, হ্যাঁ, তোমরা যদি একথা বলো যে অন্যের দু:খ-কষ্ট আমাদেরকে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে তুলেছে আর তাদের উন্নতির জন্য আমরা তাদেরকে নিজেদের করায়ত্ত করে নিতে চাই, তাহলে আমরা এতে একমত নই। তোমরা নিজেদের ঘরেই থাকো আর তাদেরকে তাদের মতই থাকতে দাও। আজকাল সব উপনিবেশবাদ (colonialism)-এর ভিত্তি বিভ্রান্তিপূর্ণ এ দাবীর ওপরই চলছে যে, আমরা তাদের মঙ্গলের জন্যই তাদের দেশ দখল করেছি। আর প্রত্যেক দেশের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে এই বাহানার আশ্রয়ই নেয়া হয়। কিন্তু এ দাবীর স্বরূপ অল্পকাল পরই প্রকাশ পেয়ে যায়। সে দেশের সমস্ত সম্পদ নিজেরা কুক্ষিগত করে ফেলে আর সেই দেশের বাসিন্দাদের কিছু জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে না।

পূর্ব আফ্রিকার অবস্থা দেখো! সেখানে ইউরোপীয় গভর্ণমেন্ট শাসন কার্য চালাচ্ছে, কিন্তু সেখানে অবস্থা এমন যে ওখানকার বড় বড় ধনবান ও বিত্তশালীরা সবাই ইংরেজ, আর সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা যারা তারা সব হত দরিদ্র এবং তারা ওই ইংরেজদের চাকর-বাকর হয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছে। এজন্যই বলা হয়েছে, তোমার স্বজনদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ভাবনা করো, অন্যদেরকে তাদের স্ব-অবস্থানে থাকতে দাও।

তারা যত গরীবই হোক না কেন নিজেদের দেখাশোনা তারা নিজেরাই করে নেবে। যদি বলা হয় যে–তবে কী তাদের সাহায্য সহায়তা করা হবে না? তবে এর জবাব হলো এই যে, ইসলাম এ কথা বলে না যে অপরের সেবা করো না বরং ইসলাম যা কিছু বলে তা হলো লোভ লালসার বশবর্ত্তী হয়ে বা লাভের আশায় দেখা-শোনা করো না। সেবা তো একজন শিক্ষকও করে থাকেন তবে তার সেবা এতটুকুই হয়ে থাকে যে তিনি জ্ঞান শিক্ষা দেন আর এর বিনিময়ে বেতন-ভাতাদি নিয়ে থাকেন। কিন্তু এই আগ্রাসী লোকেরা তো কোন দেশে যখন যায় তখন সেখানকার জমিজমা নিজেদের লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয় আর এভাবে হাজার হাজার জনবসতি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই ইসলাম বলে এ পদ্ধতি

বিধিসম্মত নয়। প্রথম কথা হলো অপরের দেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যেও না। আর যদি যেতেই হয় তবে সেবক রূপে যাও অর্থাৎ অন্যের মঙ্গলার্থে যাও, অপর দেশ করায়ত্তের অভিপ্রায় না থাকলে সাহায্য সহায়তা প্রদানে নিষেধ নেই। নিষেধ রয়েছে এটাই, যাতে লোকেরা সেই দেশে সেবকরূপে না যেয়ে বরং অন্য দেশ করায়ত্ত করে নিতেই গিয়ে থাকে। এবারে দেখো! বলশেভিকরাও কম যায় কীসে? তারা ফিনল্যান্ড এর ওপর চড়াও হয়ে তা করায়ত্ত করে নিয়েছে আর রব উঠিয়েছে যে, আমরা সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাই, ইসলাম বলে, এ পদ্ধতি বিধিসম্মত নয়, এ থেকে তোমাদের বিরত থাকা উচিত।

বাস্তবতা হলো এটাই যে, উপনিবেশের সকল সমস্যা কেবল আর কেবলমাত্র সে ভাবেই সমাধান হতে পারে, যা ইসলামে বর্ণিত হয়েছে, বিদ্যমান অন্য সকল ব্যবস্থাই ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ।

ইসলামী লীগ অব ন্যাশন্স এবং এর চারটি মৌলিক নীতিমালা

তৃতীয় পন্থা ইসলাম এটা নির্দেশ করেছে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব যদ্দিন প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে একই ব্যবস্থাপনার আওতায় না আসছে তদ্দিন সব রাষ্ট্রকে স্ব-স্ব গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। গোটা বিশ্বকে একত্রিত করে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে একই ব্যবস্থার আওতায় আনা এটা ইসলামের নীতিমালা। তবে যতক্ষণ তা না হচ্ছে তদ্দিন পর্যন্ত ঝগড়া বিবাদ নিরসন করার জন্য ইসলাম এই দিক নির্দেশনা দান করে যে

وَاِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا
بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا
الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

[সূরা হুজুরাত:১০]

ওয়া ইন তাইফাতানে মিনাল মুমিনীনাক্বতাতালু ফাআসলিহু বায়নাহুমা ফাইম্‌বাগাত ইহদাহুমা আ'লালউখরা ফাক্বাতেলুল্লাতি তাবগী হাত্তা তাফিআ ইলা আমরিল্লাহে ফাইন ফাআত ফাআসলিহু বায়নাহুমা বিলআ'দলে ওয়া আক্বসেতু ইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুল মুক্বসেতিন [হুজুরাত:১০)

অর্থাৎ যে রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে তোমরা তাদের দু'য়ের মাঝে সন্ধি করিয়ে দাও। যদি তারা সন্ধি না করে ভালবাসার সাথে পরস্পরের ঝগড়া বিবাদ না মিটায় আর এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ওপর আগ্রাসন চালায় তাহলে সকল রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে আগ্রাসনকারীর মোকাবেলা করো আর যখন সে রাষ্ট্র পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বলে যে ঠিক আছে, যুদ্ধ বন্ধ করছি। তখণ বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মাঝে পূণর্বার সন্ধি করাও এবং বিস্তারিত ভাবে শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করে চুক্তি নামায় স্বাক্ষার করাও। তবে স্মরণ রেখো! চুক্তিনামা চূড়ান্তকালে তারা কেন যুদ্ধে লিপ্ত হলো? সেই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সমতা ও ন্যায়বিচারের মানদন্ড লঙ্ঘন করো না। আবার এমন করো না যে নিজেদের বখরা চেয়ে বসো, বরং যা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ ছিল, ততটুকু মীমাং-সা করার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখো।

লক্ষ্য কর! এটা কত জাজ্বল্যমান ভবিষ্যদ্বাণী। এ আয়াত যে কালে অবতীর্ণ হয়েছে সে কালে এমন কোন মুসলমান জনবসতি ছিল না যাদের মাঝে দ্বন্দ্ব সংঘাত হবার আশঙ্কা ছিল। অতএব, এটা প্রকৃতপক্ষে আগামীর জন্য এক ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল। **'বাকী'** এবং **'ক্বাতালু'** শব্দদুটোও রাষ্ট্র বিষয়ক প্রেক্ষিতের প্রতি নির্দেশ করছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন যে, দুটি রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে, তোমাদের এ দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে, সেই রাষ্ট্রদ্বয়কে বাধ্য করো যাতে তারা জাতিসমূহের সালিশদারের থেকে নিজেদের ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিয়ে নেয়। তারা উভয়পক্ষ মেনে নিলে উত্তম, আর যদি মেনে না নিয়ে এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রের উপর হামলা করে বসে তবে অবশিষ্ট সব রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় হবে যে আক্রমণকারীর মোকাবেলায় সবাই একতাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং সম্মিলিত ভাবে আক্রমণকারীকে পাল্টা আক্রমণ করে, তাকে পরাভূত করবে। অবশেষে, সেই আক্রমণকারী পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়ে গেলে পর বিশ্বস্ততার সাথে ন্যায়ানুগ শর্তাবলী নির্ধারণ করে নাও।

প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে ঐ রাষ্ট্রকে টুকরো টুকরো করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করো না। এই আয়াতে করীমায় যে নীতিমালা বর্নিত হয়েছে তা হলো-

(১) দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি বিরোধ দেখা দেয় তবে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো চাপ প্রয়োগ করে তাদের মতানৈক্য দূর করে সমঝোতায় আসতে বিবদমান রাষ্ট্রকে বাধ্য করবে।

(২) তাদের মধ্যে কোন রাষ্ট্র তা না মেনে যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে সকল রাষ্ট্র সম্মিলিত ভাবে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করো।

(৩) আক্রমণে পরাভূত হয়ে সমঝোতায় পৌঁছতে রাজী হলে সবাই মিলে শান্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।

[আয়াতে প্রথম নির্দেশ হলো শান্তি, কথা-বার্তা হবে শান্তিপূর্ণভাবে, আর পারস্পরিক সহাবস্থানও হবে নির্বিঘ্ন এবং দ্বিতীয় নির্দেশ শান্তি স্থাপন আর তদউদ্দেশ্যেই শর্ত নির্ধারণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। কেননা শান্তি বজায় রাখতে পূণর্বার শর্ত নির্ধারনে নিষেধ নেই। আদল (ন্যায় বিচার) এর বিস্তার দানের প্রতিও এটা এক দিক নির্দেশ বিশেষ।]

(৪) কিন্তু যুদ্ধ হওয়ার কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে কিছু করো না। প্রাপ্য যা তা তাকে দাও। সত্যিকার প্রাপ্যতা থাকা সত্ত্বেও

কোন কোন সময় সঠিক দাবীদারও রাগে-ক্ষোভে আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

(৫) **'ওয়া তাফসিত'** দিক নির্দেশ করছে যে পরাজিত রাষ্ট্র থেকে বিজয়ী বা বিজয়ের পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থোদ্বারে লেগে যেয়ো না।

ইসলাম সেই যুগে এই লীগ অব ন্যাশনজ এর রূপরেখা উপস্থাপন করেছে যখন এরূপ কোন পরিস্থিতি কারও কল্পনাতেও ছিল না। আর আল্লাহ তাআলা এই রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত করেছেন যা মহান এক কর্ম, আর যা কেবল নবীগণের খলীফাগণই করতে সক্ষম। কেউই এটা সাব্যস্ত করতে পারবে না যে, শত শত বছর পর্যন্ত এমন তাৎপর্যপর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা আমি উপস্থাপন করলাম তদসম্পর্কে নবী ও খলীফাগণ ব্যতীত আজ পর্যন্ত অন্য কেউ কোন ঐশী গ্রন্থ থেকে বের করে তা দেখিয়েছে।

ইউরোপীয় লীগ বিরোধীতার কারণে ফলপ্রসূ হয় নাই আর **আহমদীয়াত** [অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম শীর্ষক বক্তব্য যা নিবন্ধ আকারে ১৯২৪ সনে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বৃটিশ রাজত্বাধীনে বিদ্যমান ধর্মীয় নেতাদের সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়েছিল।] নিবন্ধটিতে এ বিষয়ের প্রতি আমি পূর্বেই ইঙ্গিত করেছিলাম যে, লীগ গঠন করলে পবিত্র কুরআন করীমের নীতিমালা অনুযায়ী গঠণ করা উচিত। কিন্তু লীগ গঠন করতে যেহেতু এ সব নীতিমালা অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই এ জন্য তা নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান লীগ অব ন্যাশনজ এর বিফলতার কারণ

১৯২৪ সনে আমি যখন বিলেতে গিয়েছি আর বক্তৃতা দিয়েছি, সে কালে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে নতুন নতুন সব League of Nations গঠিত হচ্ছিল আর রাশিয়া ও অন্যান্যরা আবেদন করে আসছিল যে আমাদেরকেও এ জোটের সদস্য করে নেয়া হোক। সেই সময়েই আমি লিখে প্রকাশ করেছিলাম যে, এই লীগ বিফল হবে। আর যে নীতিমালার কথা আমি তখন উল্লেখ করেছিলাম, তা আমার প্রদত্ত বক্তৃতায় আমি সবিস্তারে বর্ণনাও করে দিয়েছিলাম। আর বলেছিলাম যে, "এই **পাঁচটি** মৌলিক নীতিমালা সমুন্নত রাখা না হলে এই লীগ সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে না। ওই লীগই সফলতা লাভ করবে, যা পবিত্র কুরআন করীমের নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত। সেই লীগ নয়, যা নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে অন্যদের সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরে, যেমন আমি লিখেছিলাম, বর্ণিত এই পাঁচটি অপূর্ণতা দূরীভূত করে দেয়া হলে কুরআন করীমে বর্ণিত যে লীগ অব ন্যাশনজ তা গঠিতও হয়। প্রকৃতপক্ষে অমন লীগই কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে আর সেই লীগ নয় যা নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে অন্য লোকের দ্বারে দ্বারে করুণা ভিক্ষে করে বসে থাকে।"

অনুরূপভাবে আমি আরও লিখেছি যতক্ষণ লোকেরা ইসলামের শিক্ষার এ মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম না হচ্ছে যে, আমরা সবাই সংবেদনশীল একই প্রাণ থেকে উদ্ভূত, আর উন্নয়ন ও প্রগতির এই যে গতিধারা সর্বজাতির সাথেই তা সংবদ্ধ করে রাখা আছে। কোন জাতি শুরু থেকেই একই হাল অবস্থার ওপর দিনাতিপাত করে আসছে না আর ভবিষ্যতও একই ভাবে চলতে থাকবে না। কলহ-বিবাদ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। মানুষের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতি সমূহের উত্থান পতনের দুর্বিপাকও বিলুপ্ত হবার নয়।

গরীবদের দুর্দশা দূর করতে ইসলামের চারটি নির্দেশনা

দেশ ও জাতিতে যথাযথভাবে শান্তি বিরাজমান রাখতে হলে এ নীতিসমূহ প্রতিপালিত হওয়া জরুরী। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি বজায় না থাকলে কেবল মাত্র কোন এক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তিপূর্ণ অবস্থা উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারে না। তবে আন্তর্জাতিক শান্তির সাথে সাথে যেহেতু অভ্যন্তরীণ শান্তিও ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য, একারনে আমি এখন সে কথাও বলছি যা অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনের জন্য ইসলাম নির্দেশ করেছে।

প্রথম নির্দেশনাঃ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রাপ্য অংশ বন্টন

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইসলাম চারটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আর এ চারটি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য একটিই আর তা হলো দরিদ্রদের দু:খ-কষ্ট যেন দূর হয়। সমাজে অশান্তি ছড়িয়ে পড়া নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে এর মস্ত বড় এক কারণ এটাই দেখা যায় যে, সম্পদের বন্টন সঠিকভাবে হয় না। ফলে তা কতিপয় ব্যক্তির নিকট কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আর এতে দরিদ্রদের সম্পদ বৃদ্ধি করবার সুযোগই হয় না। ইসলাম এই ক্রটি দূর করতে পরিত্যক্ত সম্পদ অংশীদারদের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামী বিধানমতে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেকের সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হবে আর এ ভাবে মায়ের, বাবার, ছেলের, স্বামীর, স্ত্রীর অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদারের তার নির্ধারিত অংশের প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে থাকে। আর কারও এই এক্তিয়ার নেই যে সে এই বন্টননীতিতে নিজের ইচ্ছামত কোন পরিবর্তন করবে বরং কুরআন করীম এই নির্দেশনাই দেয় যে এই নির্ধারন অনুযায়ী সম্পদ বন্টন না করলে তোমরা পাপী সাব্যস্ত হবে। ইসলামের এই শিক্ষার তুলনায় অন্য ধর্মগুলো, যাদের কোনটিতে তো কেবল ছেলেদেরকে উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে আবার কোনটিতে অন্য কাউকে। **'মনু'**-তে লিপিবদ্ধ আছে যে, শুধু পুত্রদেরকে সম্পদের উত্তরাধিকার দিবে কন্যাদেরকে নয়। এতে ফল এটা দাঁড়ায় যে এক ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির হাতে যাবতীয় সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে যায় আর

গরীবেরা উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ইসলাম বলে, তোমরা যতক্ষণ নিজেদের সম্পদ জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে না দিচ্ছ ততক্ষণ জাতির উন্নতি সাধিত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, লক্ষ্য করো! এক ব্যক্তির যদি এক লাখ রূপী থাকে আর তার পুত্র সন্তান থাকে দশ জন তাহলে প্রত্যেকে দশ হাজার করে পাবে, পরবর্তীতে পুত্রদের প্রত্যেকের যদি তিন জন বা চারজন করে পুত্রসন্তান থাকে তবে তাদের একেকজন তিন হাজার বা আড়াই হজার রূপী করে ভাগে পাবে। অর্থাৎ দশ হাজার রূপী ভাগ বন্টন হয়ে আড়াই বা তিন হাজারে এসে ঠেকছে। ফলে সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে সবাইকে নব উদ্যোগে নব প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। এটা হতে পারবে না যে, তারা কেবলমাত্র বাপ-দাদার সম্পদের ওপর নির্ভর করে অলস বসে থেকে দিন কাটাবে। এভাবে বসে কাটালে তারা নিজেরা কেবল অকর্মণ্যই হবে না বরং নিজেদের সম্পদকেও প্রবৃদ্ধিহীন এক স্থবিরাবস্থায় ফেলে দেবে।

পাঞ্জাবে নব বসতি স্থাপন কারীদের জন্য জমি বন্টনের ক্ষেত্রে ইংরেজরা এই শর্ত আরোপ করেছিল যে, শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারের অংশীদার হবে তবে এখন অবশ্য তারা সেই শর্ত উঠিয়ে নিয়েছে।

দ্বিতীয় নির্দেশনাঃ অর্থ কড়ি জমিয়ে পুঞ্জীভূত করে রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা

দ্বিতীয়ত: অর্থকড়ি জমা করে রাখতে ইসলাম বিধিনিষেধ আরোপ করেছে অর্থাৎ ইসলাম এটা চায় না যে অর্থ প্রবাহ বন্ধ করে রাখা হোক, বরং ইসলাম বাধ্য করে যে লোকেরা হয় অর্থ খরচ করুক নতুবা তা বিনিয়োগ করুক। কেননা, এই দু'ভাবে অর্থ প্রবাহের চক্র চালু থাকবে আর জনগণ উপকৃত হবে। কিন্তু কেউ যদি এমন না করে তবে ইসলাম তাকে এই সতর্কবাণী শুনায় যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলা বলেন- যেই সোনা রূপা ইহজগতে সে জমা করে রেখেছিল, কিয়ামত দিবসে তা আগুনে তাতিয়ে তাকে দাগ দেয়া হবে। এ নির্দেশনায় প্রজ্ঞার দিক হলো এটা যে, লোকেরা সোনা রূপা জমা করতে থাকলে গরীবদের কর্মসংস্থান হবে না। কিন্তু তারা যদি অর্থ বিনিয়োগ করে কোন কাজে লাগায়, তাহলে সেই সব লোক যারা লেন-দেনের মধ্যে থাকবে তারা উভয়ে উপকৃত হবে। এভাবে কিছু লোক কর্মচারী রূপে আবার কিছু লোক শ্রমিক হিসাবেও উপকৃত হবে। উদাহরণ হিসেবে, কেউ হয়তো কোন বহুতল ভবন নির্মাণ শুরু করল। তাহলে সেই ইমারত যদিও সে নিজের জন্য বানাবে তবুও টাকা খরচ হওয়ার কারণে কতিপয় লোকের জীবিকা নির্বাহের উপকরণ যোগানো হয়ে যাবে। ইসলাম নিরর্থক অট্টালিকার পিছনে অপচয় এমনিতেই নিষেধ করে। তবুও দৃশ্যত: যদিও সে অহেতুক অট্টালিকা না-ও বানায় বরং নিজের উপকারার্থেই বানায় তাহলেও লোহা লক্কড়ের মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি , রাজমিস্ত্রি ,দিনমজুর আর অন্যান্য আরও লোকদের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু যদি সে তা না করে সোনা রূপার গহণা গড়ে নিজ গৃহের সিন্দুকে পুরতে শুরু করে তাহলে এতে অপর কারো উপকার হবে না। তাই, ইসলাম অর্থ কড়ি জমিয়ে রাখতে নিষেধ করে আর একইভাবে নারীদের জন্য অধিক সংখ্যায় গহনা গড়া পসন্দ করে না, তবে সামান্য কিছু গহনা তাদেরকে গড়ে দেয়া বৈধ।

তৃতীয় নির্দেশনাঃ সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা

তৃতীয়ত ইসলাম সুদের ওপর ধার প্রদানের প্রতি নিধেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সুদ এমন এক ব্যাপার যা টাকা পয়সাকে তাড়িত করে এনে একই হস্তে পুঞ্জীভূত করে দেয় । এর মাধ্যমে এমন ব্যবসায়ী, পূর্ব থেকে যে দেউলিয়া হয়ে বসে আছে আর যার কাছে কোন এক সময়ে বিক্রিযোগ্য কোন পণ্যও আর থাকে না, সে-ও টাকা পয়সার প্রয়োজন পড়লে যত টাকা তার প্রয়োজন, ব্যাংক থেকে সহজেই তা নিয়ে নেয়, অথবা সাধারণ এক ব্যবসায়ী হয়েও যার ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রখর সে কোন এক ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্টের সাথে সখ্যতা গড়ে নিয়ে তার থেকে এক দুই লক্ষ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে নেয় আর স্বল্পকালের মধ্যেই দু'লাখ থেকে দশ লাখ বানিয়ে নেয়। আর এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে কোটিপতি বনে যায়। এ কারণেও বিশ্বের মস্ত বড় ক্ষতি সাধিত হয়। আমাদের দেশের কৃষকরা বেশ ভালভাবেই জানে, তাদের টাকা কড়ি, টাকা লগ্নিকারী বেনিয়াদের কাছে কীভাবে চলে যায়। সূদে ধার নেয়া ছাড়া দিনাতিপাতের কোন সুযোগ তাদের যদি থাকতো, তাহলে কৃষকদের প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা এখনকার চেয়ে বহু গুণে ভাল হতো।

কিন্তু সুদের ওপর এক কৃষক, কোন সুদ ব্যবসায়ী থেকে যদি দুই হাজার টাকা ধার নেয় আর কয়েক বছরে সুদের টাকা দশ হাজারও দিয়ে ফেলে তবুও তার ধার নেয়া ওই দুই হাজার টাকা অপরিশোধিত ঋণ হিসেবেই রয়ে যায়। অতএব সুদ, মস্তবড় এক অভিশাপ যা মানবজাতির মাথার ওপর বোঝা হয়ে চেপে বসেছে, এটা এক 'জোঁক' বিশেষ যা গরীবের রক্ত শুষে নিচ্ছে।

বিশ্ব, শান্তি ও স্বস্তির শ্বাস ফেলতে চাইলে এর পদ্ধতি হবে এটাই যে বিশ্ব থেকে সুদপ্রথা মিটিয়ে দিতে হবে আর এভাবে মুষ্টিমেয়দের হাতে ধন সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে। (চলবে)

ভাষান্তর : **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

“সত্যের সন্ধানে” অনুষ্ঠান ও আমাদের পবিত্র দায়িত্ব

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে টানা চারদিন আবারও সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান **‘সত্যের সন্ধানে’** এমটিএ-তে সম্প্রচারিত হতে যাচ্ছে, ইনশাল্লাহ। দোয়ার মাধ্যমে একাজে ঝাপিয়ে পড়ুন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন:

তবলীগ করা প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসূলকে সম্বোধনের মাধ্যমে এই তবলীগের দায়িত্ব প্রত্যেক অনুসারীকে অর্পন করেছেন (সূরা মায়েদা: ৬৮আয়াত)।

হুযূর আকদাস (আই.) নিজ অনুগ্রহে ও উদ্দ্যোগে বাংলাভাষীদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারনের জন্য এই বিশাল আয়োজন করেছেন। অতত্রব এ থেকে **আমরা যেন কোনমতেই নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গকে বঞ্চিত না রাখি**। ৩১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা থেকে টানা দু’ঘন্টা এ অনুষ্ঠান চলবে। শুক্রবার ১লা জানুয়ারী,২০১০ রাত ১০টা থেকে ১ঘন্টা, ২রা ও ৩রা জানুয়ারী শেষের দু’দিন রাত সাড়ে আটটা থেকে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত এই প্রশ্নোত্তর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে ধার্য করা হয়েছে। হুযূর আকদাস (আই.) বিশেষ বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর সভার সময় বৃদ্ধি করেছেন। আমরা যেন এ সুযোগ হেলায় না হারাই। (শেষের দিন রাত ৯টায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে পারে।)

প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই অ-আহমদী অতিথিবর্গ অগ্রাধিকার লাভ করবেন। তাই তাদেরকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করুন। প্রশ্নকারীকে নির্ধারিত বিষয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করুন। কিন্তু তিনি যদি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নও করে ফেলেন বা অসংযত কথাও বলে ফেলেন তাতে অনুষ্ঠানের কোন ক্ষতি হবে না। অতিথি মেহমানরা নিজে প্রশ্ন করতে অপারগ হলে ব্যতিক্রম হিসেবে অন্য কেহ তাঁর প্রশ্নটি উপস্থাপন করতে পারেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে অতিথি-প্রশ্নকারী অগ্রাধিকার লাভ করবেন।

আসন্ন এই তবলীগি সভাগুলো সফল করতে এই সার্কুলারটি জামা’তের সকল সদস্যদের কাছে পড়ে শোনানোর অনুরোধ করছি। কর্মকর্তাসহ সকলকেই তবলীগের কাজে এখন থেকে নামিয়ে দিন যেন ৩১ তারিখ থেকে বিপুল পরিমাণ মেহমানদেরকে আমরা **সত্যের সন্ধান** দিতে পারি। যাদের বাসায়/বাড়ীতে এমটিএ-এর ডিশ কানেকশন রয়েছে তাদেরকে **নিজেদের বাসায়/বাড়ীতে অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠান দেখাতে অনুপ্রানিত করুন**। আমাদের মনে রাখতে হবে, হুযুরের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই বিশাল অনুষ্ঠানকে সফল করতে আমাদের সবাইকে বিরাট কুরবানী ও পরিশ্রম করতে হবে।

আসন্ন প্রোগ্রামটিকে এমনভাবে কাজে লাগান যেন এরপর থেকে একাধারে তবলীগি সভা নিজেরাই করতে পারেন। আপনারা অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে আপনার জামা’তের প্রতিদিনের কার্যক্রম রিপোর্ট বাংলাদেশের কেন্দ্রে প্রদান করে বাধিত করবেন যাতে হুযুরের কাছে তা পৌঁছে দেয়া যায়।

যে সব আঞ্চলিক বা স্থানীয় কেন্দ্রে বিভিন্ন স্থান থেকে ‘মেহমান’ জড়ো করা হবে তাতে আঞ্চলিক তবলীগি আহবায়কদের সহযোগীতা গ্রহণ করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই গুরু দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সৌভাগ্য দিন। আমীন।

ওয়াসসালাম

মোবাশশেরউর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

MTA LIVE প্রোগ্রামে সরাসরি যোগাযোগ করার মাধ্যম–

টেলিফোন নম্বর : 012-44-208-687-8010

ফ্যাক্স নম্বর : 012-44-208-687-8037

এস এম এস পাঠানোর নম্বর :

00-44-790-311-4512

ই-মেইল করার ঠিকানা : sslive@mta.tv

কাপুরুষোচিত হামলায় পাকিস্তানে একজন আহমদী শিক্ষকের শাহাদত বরণ

প্রেস রিলিজ

৩০ নভেম্বর, ২০০৯ইং

সিন্ধু প্রদেশের সংঘির জেলার জনাব রানা সলিমকে বিগত ২৬ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অতিব দু:খের সাথে নিশ্চিত করছে যে, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সংঘির জেলার অধিবাসী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য জনাব রানা সলিমকে বিগত ২৬ নভেম্বর, ২০০৯ইং তারিখে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

মাগরিবের নামায শেষে জনাব সলিম যখন মসজিদ 'বাইতুল হামদ' থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন অতি নিকট থেকে তার প্রতি গুলি ছোড়া হয়। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হয় কিন্তু হাসপাতালে পৌছার আগেই তিনি মারা যান। এশিয়া মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে যে, স্থানীয় পুলিশ অনেক দেরিতে সেখানে পৌঁছে এবং পরবর্তীতে কোন যথাযথ রিপোর্ট পেশ অথবা তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় লোকজন নিশ্চিত করেছে যে সম্প্রতি জনাব সলিম সহ ঐ এলাকার অনেক আহমদীকে বার বার ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছিল। পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করা হয় কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। শিক্ষার প্রতি ছিল তার বিশেষ অনুরাগ আর সেজন্য জনাব সলিম তার নিজ জীবন শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী **'নিউ লাইফ পাবলিক স্কুল'** নামক এক খ্যাতিমান স্কুল চালাতেন এবং অতি উত্তম মানের শিক্ষা দানের জন্য তারা সর্বদা প্রশংসিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্কুলটির উচ্চ কার্যকারিতাই ছিল ঈর্ষার অন্যতম কারণ যেজন্য স্থানীয় চরমপন্থীরা সম্প্রতি আহমদীদেরকে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

পাকিস্তানে আহমদীদের ওপর চলমান হামলার বিষয়ে এশীয় মানবাধিকার কমিশন তাদের ২৭ নভেম্বর, ২০০৯-এর রিপোর্টে উল্লেখ করেন–'*পাকিস্তান বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সর্বোচ্চ সুবিধা সংরক্ষণের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এ দেশটির বর্তমান প্রশাসন আহমদীদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। এতে যারা শুধু মাত্র আহমদীদের বিরুদ্ধেই অপরাধ সংঘটন করে কেবল তাদেরকেই অব্যাহতি পেতে দেখা যায়। এবং এটা তাদেরকে ক্রমবর্ধমান পক্ষপাতমূলক হিংস্রতা অবলম্বনে উৎসাহিত করে*'।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ শহীদের জানাযা গায়েব পরিচালনা করেন। তার আগে তিনি বলেন, "সংঘির জিলায় জনাব রানা সলিম 'নিউ লাইফ' স্কুল চালাতেন যেখানে প্রায় এক হাজার ছাত্র তালিকাভুক্ত আছে। স্কুলটি খুবই উচ্চমানের। শহীদের স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক পুত্র জীবিত আছে। আল্লাহ্ তার পরিবারকে এ সময় ধৈর্য ধারন করার সামর্থ দিন এবং শহীদকে বেহেশ্তে উঁচু মর্যাদায় উন্নত করুন"।

প্রেস সেক্রেটারী, আ.মু,জা. ইন্টারন্যাশনাল

২২ *ডিয়ার পার্ক রোড, লন্ডন।*

30th November 2009

PRESS RELEASE

An Ahmadi Muslim teacher killed in Pakistan

Mr Rana Salim of Sanghir District, Sindh was shot dead on 26 November 2009

It is with great sadness that the Ahmadiyya Muslim Jammat confirms that another member of its Jamaat, Mr Rana Salim of Sanghir District, Sindh was shot dead on 26 November 2009.

Mr Salim was walking out from the Baitul Hamd Mosque after the evening prayers when he was shot at point blank range. He was rushed to hospital but died prior to arrival. The Asian Human Rights Commission confirmed that the local police did not arrive until very late and subsequently failed to file and proper of conduct a proper investigation. Locals have confirmed that recently a number of Ahmadis in the area, including Mr Salim, had been reviving frequent threats. The police had been made aware of these threats but refused to take any action.

Mr Salim devoted his life to his passion for education. He and his wife ran the prestigious `New life' public school and they were routinely praised for providing and excellent standard of education. Indeed jealously at the high performance of the school is one of the reasons that local extremists had targeted Ahmadis in the recent past. Regarding the continued attacks on Ahmadis in Pakistan, the Asian Human Rights Commission reported on 27 November 2009.

"The State Consistently fails in its responsibility to protect them (Ahmadis), despite repeated claima by the current administration that it represents the best interests of minorities in the country. The impunity seen to be enjoyed by those who commit crimes against Ahmadis only further encourages discriminatoy violence."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, led the funeral prayer of the deceased in absentia on 27 November 2009. Prior to this he said:

" Mr Rana Salim ran the `New Life' school in Sanghir District in which around 1000 students are currently enrolled. The standard of the school is very high........ The deceased is survived by his wife, two daughters and one son. May God grant his family patience at this time and may He elevate the status of the deceased in heaven."

ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত

মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব
মোহাম্মদ আব্দুল মোমিন

(৪র্থ কিস্তি)

ঘানা

একটি হাদীসের কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হৃদয়ে আফ্রিকায় প্রচার কার্য চালানোর প্রতি বিশেষ অনুপ্রেরণা জাগে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "আফ্রিকায় তবলীগের কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে মূলত একটি হাদীস আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। হাদীসটি হল, হাবসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আরবে হামলা করে মক্কা মুকররমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাবে। আমি যখন এ হাদীসটি পড়লাম তখন আমার মধ্যে ঐ প্রেরণা সৃষ্টি হল যে, এই এলাকাকে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করতে হবে যেন ভবিষ্যতকাল সংক্রান্ত এই সতর্কবাণী আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে অপসারিত হয়ে যায় এবং মক্কা মুকাররমায় আক্রমণের কোন সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট না থাকে।

(আল ফযল, ২৫ মার্চ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৪, কলাম ৪)

তিনি আফ্রিকার সর্বপ্রথম মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব নাইয়ারকে নির্বাচিত করেন। যিনি তৎকালীন সময়ে লন্ডনে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। মাওলানা নাইয়ার সাহেব ১৯২১ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘানার বন্দর 'সল্টপন্ড'-এ পৌঁছান। এখানে ভাড়ায় একটি বাসা নিয়ে মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠা করেন। অত:পর ১৯২১ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে তিনি নাইজেরিয়া গমন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ঘানার জন্য মৌলবী হাকীম ফজলুর রহমান সাহেবকে মনোনীত করেন। ১৯২২ সালের ১৩ মে তিনি ঘানা মিশনের দায়িত্ব লাভ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭০ সালের ১৮ থেকে ২৬ এপ্রিল ঘানা সফর করেন। ২০ এপ্রিল হুযূর (রাহে.) ঘানার প্রেসিডেন্ট ব্রিগেডিয়ার এ. এ. আফ্রিফা এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হুযূর (রাহে.) সল্টপন্ডে আহমদীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আজকের দিনটি আপনাদের জন্য একটি মহান দিন। আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র আপনাদেরকে এই জীবন্ত ধর্মে অংশগ্রহণের সুযোগই দেন নি, বরং আজ আপনাদেরকে হযরত মাহদী-এ মাওউদ (আ.)-এর খলীফার সাথে সাক্ষাতেরও সুযোগ দান করেছেন।" (খালিদ, অক্টোবর ১৯৭০ পশ্চিম আফ্রিকা সফর, পৃ: ৬০, ২য় কলাম)

হুযূর (রাহে.) ১৯ এপ্রিল তারিখে আক্রায় একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২১ এপ্রিল কামাসিতে মিশন হাউজের উদ্বোধন করেন। ২২ এপ্রিল টেচিমানে-এ নব-নির্মিত মসজিদের উদ্বোধন করেন। ১৯৮০ সনের ২৪-২৯ আগষ্ট তারিখে ২য় বার তিনি ঘানা সফর করেন।

একটি সংবাদ সম্মেলনে হুযূর (রাহে.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমাদের জন্য আপনার বাণী কি? হুযূর (রাহে.) উত্তরে বলেন, Let humans learn to love humans অর্থাৎ আসুন মানুষকে মানবীয়-বোধের প্রতি অনুরক্ত হতে শেখাই।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ঘানা সফর করেন। ৫ ফেব্রুয়ারী হুযূর (রাহে.) মিশন হাউজের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। ঐদিনই একজন চীফ হুযূর (রাহে.)-এর হাতে বয়আত করেন। ১১ ফেব্রুয়ারী ঘানার প্রেসিডেন্ট জেরিজন রাউনিংস-এর সাথে হুযূর (রাহে.) সাক্ষাৎ করেন। একই দিন হুযূর (রাহে.) আক্রাফু-তে ১৯২১ সালে বয়আতকারী ১ম আহমদী চীফ মেহদী আপাপা-র কবর যিয়ারত করেন। হুযূর (রাহে.) অত্র এলাকায় বর্তমান ঘানায় নির্মিত ১ম আহমদীয়া মসজিদে ২ রাকাত নফল নামায আদায় করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) ২০০৪ সালে ১৩-২৫ মার্চ পর্যন্ত ঘানা সফর করেন। হুযূর (আই.) ঘানায় প্রবেশ করে বলেন, I have come here to see my loved ones অর্থাৎ আমি এখানে আমার প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। ১৪ মার্চ ২০০৪ সালে হুযূর (আই.) তালিমুল ইসলাম সেকেন্ডারী স্কুল Ekumfi Essarkyie পরিদর্শন করেন। এখানে হুযূর অক্টোবর ১৯৭৯ থেকে মার্চ ১৯৮৩ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সনের ১৫ মার্চ হুযূর (আই.) ঘানার প্রেসিডেন্ট John Agyekuwm Kufuor-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, ১৯৭৭ সালে হুযূর ঘানায় এসেছিলেন আমরা আপনাকে ঘানাবাসী হিসেবে মনে করি। শেষে হুযূর (আই.) ইজতেমায়ী দোয়া করান। ১৮ মার্চ জলসা সালানা ঘানায় এ দেশের প্রেসিডেন্ট অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আমি হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানাই কেননা তিনি ৮ বছর এখানে থেকেছেন। এখন খোদা আপনাকে বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের নেতা বানিয়েছেন এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। ঘানা এজন্য গর্ববোধ করে।"

হুযূর (আই.) ২০০৪ সনের ২১ মার্চ আশান্তিহেন (Asantehen)-এর বাদশাহ Osei Totul II (ওসেই টুটুল ২য়)-এর প্রাসাদে গমন করেন। বাদশাহ আসান্তিহেন রাজ্যের প্রতীক Porcupine-খচিত স্মারক হুযূর (আই.)কে উপহার দেন। মোকাররম আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেব বলেন, "আমার জানামতে আশান্তিহেনের পক্ষ

থেকে এই বিশেষ উপহার একমাত্র হুযূর (আই.) ব্যতীত আর কোন বিদেশীকে প্রদান করা হয়নি।"

নাইজেরিয়া

হযরত মওলানা আব্দুর রহিম নাইয়ার সাহেব ১ম বারের মত ১৯২১ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে নাইজেরিয়া পৌঁছেন। ৪ মাস অবস্থানের পর তিনি ঘানা ফিরে যান। ১৯২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্থায়ীভাবে মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোস পৌঁছেন। মওলানা নাইয়ার সাহেব একদিন একটি মসজিদে যান। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলেন, এই মসজিদের একজন সাবেক ইমাম আল ফায়ানমো তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমাদেরকে এই স্বপ্ন শুনিয়েছেন, "তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন আর তিনি (আ.) তাঁকে বলেছেন, তাঁর (আ.) পক্ষে এই দেশে আসা সম্ভব হবে না, কিন্তু তাঁর একজন অনুসারী এখানে এসে হেদায়াতের কারণ হবেন।"

মসজিদে উপস্থিত সকলে এ কথার সত্যায়ণ করেন। হযরত মওলানা আব্দুর রহীম–তিনি নিজেও একজন আহমদী ছিলেন, বলেন, "এ কথা শুনে এবং নিজের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে তার চোখে পানি এসে গেল। তারপর এখানকার দশ হাজার লোক বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।"

মওলানা নাইয়ার সাহেব ১৯২২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর লাগোসে তালীমুল ইসলাম মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু করেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে যান। ফলশ্রুতিতে ১৯২২ সালের ২১ জানুয়ারী তাঁকে লন্ডনে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর নাইজেরিয়াতে কোন কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ যেতে পারেনি। হাকীম ফজলুর রহমান সাহেব সেখানকার দেখাশুনা করেন। ১৯৪৩ সালের ১২ মার্চ হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব লাগোসে ১ম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, লন্ডনের ১ম মসজিদের নাম "মসজিদ ফযল" রাখা হয়েছে এর নামও "মসজিদ ফযল" নির্ধারণ করা ছিল। ১৯৪৫ সালে মৌলভী নূর মোহাম্মদ নাসিম সাইফী সাহেবকে নাইজেরিয়া পাঠানো হয়। তিনি The Truth নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। (তারিখে আহমদীয়া, ১ম খন্ড ৪৬৯ পৃ:)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭০ সালে নাইজেরিয়া সফর করেন। নাইজেরিয়া থেকে ফেরার সময় ১৩ এপ্রিল তারিখে তিনি নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াকুবো গোনকে বলেন, "আপনারা একটি মহান দেশের মহান অধিবাসী........আপনারা একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী। এমন এক ভবিষ্যত যা আপনাদের কল্পনারও বাইরে.....আপনারা সত্যের মশাল নিয়ে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যান। যেন জগদ্বাসী আপনাদের মাঝে তাদের আশার আলো দেখতে পায়। আর মানুষ আপনাদের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়।" ১৯৮০ সালের ২০-২৪ সেপ্টেম্বর হুযূর (রাহে.) আবারও নাইজেরিয়া সফর করেন। মোকাররম মোবাশ্বের আহমদ শাহেদ ১৯৯১ সালের ৩১ মার্চ মোবাল্লেগ হিসেবে নাইজেরিয়া পৌঁছেন। প্রায় পৌনে ২ বছর সেবা করার পর ১৯৯২ সালের ১৭ ডিসেম্বর একটি দুর্ঘটনায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল ২০০৪ সালে নাইজেরিয়া সফর করেন। ১১ এপ্রিল তারিখে হুযূর (আই.) আলারো শহরে আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন করেন। যদিও হুযূরের (আই.) আগমনের ২ মাস পূর্বে নাইজেরিয়ায় জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তবুও হুযূর (আই.)-এর আগমন উপলক্ষে প্রায় ৩০ হাজারের অধিক লোক সমবেত হয় এবং হুযূর (আই.)-এর উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বার জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.) আলারোতে জামেয়া আহমদীয়া পরিদর্শন করেন এবং এর পরিদর্শন বহিতে লিখেন, "আল্লাহ্ তাআলা জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্রদের নিষ্ঠাবান ধর্মের সেবক বানান, তাদের জ্ঞান, খোদাভীতি, প্রজ্ঞা এবং আজ্ঞানুবর্তিতার স্পৃহাকে বৃদ্ধি করুন এবং তাদেরকে খেদমতে আহমদীয়ার প্রকৃত প্রেমিক বানান'। হুযূর (আই.) ১২ এপ্রিল তারিখে ওজোকোরো মসজিদের উদ্বোধন করেন।

লাইবেরিয়া

মে, ১৯৫২ সালে মোকাররম মৌলভী মোহাম্মদ সাদেক অমৃতসরী ১ মাসের সফরে এখানে আসেন। তিনি লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট অলিম টবম্যান-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে কুরআন মজীদের একটি তফসীর সাথে আরো কিছু ইসলামী পুস্তকাদি উপহার দেন। এরপর সুফী মোহাম্মদ ইসাহাক সাহেব লাইবেরিয়ার মিশন হাউজের ভিত্তি প্রস্তর রাখেন। তিনি ১৯৯৫ সালে লাইবেরিয়ার রাজধানী মনোভিয়া পৌঁছেছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁকে বলেন, "এখন সুযোগ এসেছে মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি কর, তাদেরকে উপহার সামগ্রী প্রদান কর এবং চেষ্টা কর যেন সমগ্র লাইবেরিয়া আহমদী হয়ে যায়।"

১৯৫৭ সালের ১২ জুন তারিখে মোকাররম সুফী সাহেব প্রেসিডেন্ট হাউজে প্রেসিডেন্ট-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস ১৯৭০ সালে লাইবেরিয়া সফর করেন। ২০ এপ্রিল তারিখে লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম টিব-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তী দিন প্রেসিডেন্ট হুযূর (রাহে.)-এর সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি বলেন, "আজ আমাদের কতই সৌভাগ্য যে, এই যুগের আধ্যাত্মিক বাদশাহ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমাদের দেশে তাঁর আগমন আমাদের জন্য সম্মানের কারণ।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

৩১ জানুয়ারী থেকে ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ লাইবেরিয়া সফর করেন। ১ ফেব্রুয়ারী হুযূর (রাহে.) লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

সিয়েরালিওন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯৩৭ সালে ঘানা ছাড়াও অন্যান্য দেশসমূহেও জামা'তের বিস্তৃতির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। মৌলভী নজির আহমদ সাহেব ১৯৩৭ সালের ১৩ অক্টোবর ঘানা থেকে সিয়েরালিওনের রাজধানী ক্রিটাউনে পৌঁছান। তাঁর তবলীগে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও চীফরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে রোকপরও শহরে প্রথম আহমদীয়া মুসলিম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বু'তে আহমদীয়া মসজিদ নির্মিত হয়। একই বছর খলীফাতুল মসীহ্ (রা.) মৌলভী নজির আহমদ সাহেবকে সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকার মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ দেন এবং তাঁর নাম পরিবর্তন করে মৌলভী নজির আহমদ আলী রাখেন।

১৯৫৫ সনের ১৯ মে সিয়েরালিওনের বু' শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচার কার্যে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় শাহাদত লাভকারী প্রথম আহমদী। তাকে বু' শহরে সমাহিত করা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ৫ থেকে ১৪ মে ১৯৭০ সনে সিয়েরালিওন সফর করেন। ৬ মে হুযূর (রাহে.) কেয়ারটেকার গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। গভর্নর জেনারেল বলেন, "It is a blessing your coming here." অর্থাৎ আপনার আগমন কল্যাণের বার্তাবাহী। এরপর হুযূর (রাহে.) প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৮ মে হুযূর (রাহে.) ফ্রিটাউনের কাছে "লেস্টর" এ মসজিদ নজির আহমদ আলী উদ্বোধন করেন। ১০ মে হুযূর (রাহে.) বু' শহরে কেন্দ্রীয় মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১১ মে সিয়েরালিওন জামা'তের পক্ষ থেকে তাঁর সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বলেন, "আজকের দিনটি আপনাদের জন্য। আহমদীয়াত এবং এদেশের ইতিহাসে এই ১ম বারের মত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর খলীফা এসে সফর করেছেন।" (মাসিক খালিদ, অক্টোবর ১৯৭০, পশ্চিম আফ্রিকা সফর সংখ্যা, ১১৭ পৃ:)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) জানুয়ারী ১৯৮৮ সালে সিয়েরালিওন সফর করেন। MIL 91 এলাকায় সেখানকার চীফ এর পক্ষ থেকে হুযূর (রাহে.)কে চীফের ঐতিহ্যবাহী পোষাক পরিয়ে প্যারামাউন্ড চীফ এর সিংহাসনে বসানো হয়।" কলমা এবং বু' শহরের পক্ষ থেকে হুযূর (রাহে.)কে শহরদ্বয়ের চাবি উপহার দেয়া হয়।

সফরকালীন সময়ে হুযূর (রাহে.) দু'টি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট J.s Momo-এর সাথে হুযূর (রাহে.) সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি সিয়েরালিওনে জামা'তের অনন্য সেবার কথা উল্লেখ করে বলেন "আমরা আপনাদের সকল প্রকার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত আছি।" হুযূর (রাহে.) ২৯ জানুয়ারী সিয়েরালিওনে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।

গাম্বিয়া

১৯৫৪ সালে মি. লামিন বাড়া নিয়ে জামা'তি পুস্তকাদি পাঠ করা শুরু করেন এবং ১৯৫৮ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন ১৯৫৯ সালে নভেম্বর মাসে নাইজেরিয়ার স্থানীয় মোবাল্লেগ হামযা ও সানালো গাম্বিয়া পৌঁছান। তিনি সেখানে তিন মাস অবস্থান করেন। অবস্থানকালীন সময়ে বেশ কিছু বন্ধু জামা'তে যোগদান করেন। কর্মকর্তাদের সরাসরি নির্বাচন হয় এবং প্রতিষ্ঠানিকভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ৩০ জুলাই ঘানা থেকে জিব্রাইল সাঈদ গাম্বিয়া পৌঁছেন। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে মোবাল্লেগের অনুমতি পাবার পর এরপর মিশনারী পাঠানোর ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি লাভের পর ১৯৬১ সালের ৯ মার্চ তারিখে চৌধুরী মোহাম্মদ শরীফ সাহেব গাম্বিয়া পৌঁছেন। গাম্বিয়ার প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ উসমান দাউদ নাযায়ে ১৯৬১ সালের মে মাসে বয়আত করেন।

১৯৬৩ সালের মে মাসে ফেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাংঘাট আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। গাম্বিয়া স্বাধীনতা লাভের পর তিনি বৃটেনের রানী কর্তৃক কেয়ারটেকার গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) স্বাক্ষর ও সীল মোহরসহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক টুকরো কাপড় উপহার দেন। তাতে ১৪ জুন ১৯৬৬ লেখা ছিল। তিনি ৫ জুলাই ১৯৬৬ সালে গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর ইলহাম "বাদশাহগণ তোমার বস্ত্র হতে বরকত অন্বেষণ করবে"পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তীতে সানঘাট সাহেব "ফেরাফেনী"-তে তাঁর নিজের জমির ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যেটি গাম্বিয়ার প্রথম মসজিদ।

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭০ সালের ২ মে হতে ৫ মে তারিখ সফর করেন। ২ মে হুযূর (রাহে.) গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্যার কে, জাওয়ারা'র সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে ইংরাজিতে অনুদিত একটি কুরআন মজীদ উপহার দেন। তবে হুযূর (রাহে.) "বানোনকা কাত্তা"-তে একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হুযূর (রাহে.) "বানজাল"-এ নুসরাত জাঁহা সেকেন্ডারী স্কুলেরও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৮ সালে গাম্বিয়া সফর করেন। ২২ জানুয়ারী "সাবা"তে জুমুআর খোৎবার মাধ্যমে হুযূর (রাহে.) নুসরাত জাঁহা স্কীমের নব ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় গাম্বিয়ার এই সৌভাগ্য যে নুসরত জাঁহা স্কীমের প্রথম ঘোষণা এ দেশ থেকেই হয়েছিল

তবে সর্বশক্তিমান খোদার অনুগ্রহে এই স্কীমের দ্বিতীয় ঘোষণাও এ দেশ থেকেই হচ্ছে।"

এই সফরে হুযূর (রাহে.) ২ টি মসজিদের উদ্বোধন এবং ২ টি মিশন হাউজ ও ১ টি ক্লিনিকের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন [গাম্বিয়া মাসিক খালিদ, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পৃষ্ঠা-৪]

আইভরি কোষ্ট

১৯৬১ সালের ২ জুলাই কোরাইসী মকবুল আহমদ সাহেব আইভরি কোষ্টে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য আবিদ জান পৌঁছেন। ১৯৬২ সালে তিনি আইভরি কোষ্টের প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে কিছু জামা'তি পুস্তকাদি উপহার দেন। ১৯৬৩ সালে কোরাইসী মোহাম্মদ আফদান সাহেব, কোরাইশী মকবুল আহমদ সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি অল্প কিছু জায়গা কিনে তাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যা ১৯৬৭ সালে উদ্বোধন হয়। ১৯৭০ সনের ২৭ হতে ২৯ এপ্রিল হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) আইভরি কোষ্ট সফর করেন।

১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) আইভরি কোষ্ট সফর করেন এবং সেদেশের প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

বারকিনা ফাসো

বারকিনা ফাসোতে আহমদীয়াত পৌঁছে ১৯৯১ সালে। ঘানা জামা'তের আমীর মোহতরম আব্দুল ওয়াহাব আদম সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মিশনারী মোহতরম মোহাম্মদ ইদ্রিস শহীদ সাহেব ১৯৯০ সালে সেখানে পৌঁছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) এক সফরে ২০০৪ সনের ২৫ মার্চ এদেশে আসেন। পরের দিন তিনি (আই.) সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মি. পার লেজ আরনেষ্ট অনহি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীতে হুযূর (আই.) সেদেশের প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

হুযূর (আই.) প্রেসিডেন্ট-এর সাথে কৃষি এবং এনার্জী সরবরাহ ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে কথা বলেন। হুযূর (আই.) সেদেশের প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, যদি বারকিনা ফাসো'র জনগণ সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করে তাহলে এটি একদিন আফ্রিকার প্রথম সারির দেশগুলোর একটিতে পরিণত হবে। (আল ফযল, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪ পৃ: ৫০)

হুযূর (আই.) বারকিনা ফাসোর জলসা সালানায় অংশ নেন। ৩০ মার্চ হুযূর (আই.) সেদেশের প্রথম আহমদীয়া প্রাইমারী স্কুলের উদ্বোধন করেন এবং তিনি আহমদীয়া মিশন হাউজের ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেন। হুযূর (আই.) ১লা এপ্রিল বোবোথালাসো'তে অবস্থিত আহমদীয়া রেডিও স্টেশন পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দেন। যাতে তিনি তাঁদেরকে সালাম পৌঁছান এবং আল্লাহ্ তাআলা যাতে তাদের রক্ষাকারী হোন এ দোয়া করেন। ৩ এপ্রিল হুযূর (আই.) Wagao-তে একটি আহমদীয়া হাসপাতাল উদ্বোধন করেন। হুযূর (আই.)-এর এই সফর ৪ এপ্রিল সমাপ্ত হয়।

বেনিন

১৯৫৭ সালে বেনিনে আহমদীয়া পৌঁছে যখন নাইজেরিয়া হতে তিন ব্যক্তি আহমদীয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন। ১৯৭৪ সালের ২৭ জানুয়ারী সেখানে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৫ আগষ্ট মসজিদটি উদ্বোধন হয়। ১৯৮১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) মোহতরম আহমদ সমসের সকিয়া সাহেবকে বেনিনের মিশনারী হিসেবে নিয়োগ দেন।

আভিধানিক ভাবে 'বেনিন' অর্থ "রাজার দেশ"। ৪ এপ্রিল ২০০৪ আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) সেখানে সফর করেন। সেখানে এক সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "এখানে আমি আমার জামা'তের সদস্যদের সাথে মোলাকাতের জন্য এসেছি এবং এদেশে কিভাবে মানব সেবা করা যায় তা দেখতে এসেছি।" সেখানে তিনি স্থানীয় জামা'তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এখানে বহুদিন যাবত কোন জামা'ত কায়েম ছিল না কিন্তু আমি এখানকার মানুষের আন্তরিকতা ও ভালবাসায় মুগ্ধ। আপনারা এখানে এইজন্য একত্রিত হয়েছেন যে, খিলাফতের প্রতি আপনাদের ভালবাসা ও আনুগত্য রয়েছে।" (আল ফযল, বার্ষিক প্রকাশনা, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪ পৃ: ৭০)

এপ্রিলের ৫ তারিখে হুযূর (আই.) পোর্টো-নব'তে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ৬ এপ্রিল হুযূর (আই.) Alada-এর রাজার সাথে তার রাজকীয় বাসভবনে মোলাকাত করেন। ইতোপূর্বে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে U.K, জলসা সালানাতে মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং যেটা তাঁকে অনেক সম্মানিত করেছে।

ঐ মোলাকাতে হুযূর (আই.) বলেন, আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ এদেশের মানুষকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। আমি এও দোয়া করি যাতে আল্লাহ্ তাআলা এই রাজাকে আহমদীয়াত কবুলের তৌফিক দিন। Alada-র রাজা বলেন আমি বিশ্বাস করি যে Alada-র প্রাসাদ হুযূর (আই.)-এর উপস্থিত কল্যাণময় হয়েছে। আমরা আজ নিজেদেরকে সুখী এবং ভাগ্যবান অনুভব করছি।" [আল ফযল, বার্ষিক সংখ্যা ২০০৪ পৃ: ৭১]

সন্ধ্যায় হুযূর (আই.) Parakou-তে এর গভর্ণর হাউজে গবর্ণর-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। যেখানে ৭ এপ্রিল হুযূর (আই.) এ শহরে নির্মিত প্রথম মসজিদ উদ্বোধন করেন এবং আহমদীয়া হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। ২০০৪ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে হুযূর (আই.) বেনিন এর রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদিন সন্ধ্যায় হুযূর (আই.) আব্দুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার পরিদর্শন করেন।

(চলবে)

[তাহরীকে জাদীদের খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণীকা অবলম্বনে]

বেহেশ্‌ত কী !

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

পবিত্র কুরআনে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল মানুষের পুরস্কার হিসেবে ‘জান্নাত’ বা ‘বেহেশ্‌ত’ এর উল্লেখ রয়েছে। বেহেশ্‌ত কী–সে বিষয়ে মুসলমান আলেমগণ নানাবিধ বর্ণনা দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, বেহেশ্‌ত হচ্ছে এমন স্থান যেখানে সুস্বাদু ফলের বাগান, যেমন–আঙ্গুর, ডালিম ইত্যাদি, মধু ও অন্যান্য সুস্বাদু পানীয়, হুর-গেলমানসহ আরো অনেক উপভোগ্য উপাদান থাকবে, বেহেশ্‌তবাসীরা অনায়াসে চাহিদামত সেগুলো লাভ করবে এবং মৃত্যুর পর অর্থাৎ কেবল পরকালেই এ পুরস্কার লাভ হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে এসব বর্ণনা যে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা তাদের জানা নেই। এসবের নিগুঢ় অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে এ জগতের এসব উপভোগ্য ও লোভনীয় জিনিষকে পরকালের বেহেশ্‌তের সামগ্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে অনেকটা ভিন্নমত পোষণ করে কবি বলেছেন,

‘কোথায় স্বর্গ,
কোথায় নরক,
কে বলে তা বহু দূর,
মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক
মানুষেই সুরাসুর’।

বেহেশ্‌তের এসব অলীক ও ভ্রান্ত ধারনার বেড়াজালে আটকে পড়ে সাধারণ মানুষ পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। অনেকে এ কথাও বলতে শুরু করেছে, “নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য”।

এসব অজ্ঞানান্ধ মানুষের উদ্ধার এবং পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষাকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-এর দাস প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)কে এ জামানায় প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) আবির্ভূত হয়ে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সকল মানুষের মধ্যে বিস্তার এবং সকলকে ইসলামের

বেহেশ্‌ত কি, সে বিষয়ে মুসলমান আলেমগণ নানাবিধ বর্ণনা দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, বেহেশ্‌ত হচ্ছে এমন স্থান যেখানে সুস্বাদু ফলের বাগান, যেমন–আঙ্গুর, ডালিম, ইত্যাদি, মধু ও অন্যান্য সুস্বাদু পানীয়, হুর-গেলমানসহ আরো অনেক উপভোগ্য উপাদান থাকবে, বেহেশ্‌তবাসীরা অনায়াসে চাহিদামত যেগুলি লাভ করবে এবং মৃত্যুর পর অর্থাৎ কেবল পরকালেই এ পুরস্কার লাভ হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে এসব বর্ণনা যে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা তাদের জানা নেই।

ছায়াতলে একত্রিত করার ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। এবং খাঁটি ইসলামকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেছেন।

প্রকৃত ইসলাম কী এবং ইসলামের পথে নিষ্ঠার সাথে বিচরণ করলে কী ফল লাভ হয়, সে বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, “এটা আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, কোন দর্শন অথবা বিজ্ঞান যদি এর বর্তমান অবস্থার চাইতে হাজারগুণও উন্নতি করে তথাপি পবিত্র কুরআন এমন এক পূর্ণাঙ্গ কিতাব যে, জ্ঞানের সেই নতুন বিকাশ কখনোই একে পরাভূত করতে পারে না। যাহোক, যে লোক কখনো এ মহাগ্রন্থের একটি বাক্যও নিষ্ঠার সাথে পাঠ করেনি, তার পক্ষে সম্ভব নয় যে সে এর গভীরে প্রবেশ করে।

উদাহরণ স্বরূপ, কুরআনের শিক্ষাসমূহে বেহেশ্‌তের আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণনা করা আছে যা পরকালে পুরস্কার দানের সাথে সম্পর্কিত। এসব পুরস্কারের মধ্যে এমন বাগানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার নীচ দিয়ে নহর প্রবাহিত। এ ধরনের বর্ণনা সমূহ কেচ্ছা-কাহিনীর মত মনে হতে পারে কিন্তু ওগুলো কেচ্ছা-কাহিনী নয়। ওগুলোর এক বাস্তবতা আছে এবং তা হচ্ছে, ইসলামের শুরুতে আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্পর্কে লোকেরা সাধারণভাবে অপরিচিত ছিল। এসব বিষয় সম্পর্কে তারা ছোট্ট শিশুদের মতই ছিল। এটা আবশ্যক ছিল যে, গভীর ও সূক্ষ্ম দর্শন সমূহ বর্ণনা করতে ঐসব লোকদের কাছে এমন সব উপমা ও উপস্থাপন করা হতো যেগুলির সাথে তাদের পরিচয় ছিল এবং যেগুলি ঔসব বিষয়ের বাস্তবতা বুঝতে তাদেরকে সাহায্য করে। এ কারণেই বেহেশ্‌তের বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআন এ উপায় অবলম্বন করেছে। বেহেশ্‌তের প্রতীকী বর্ণনায় পবিত্র কুরআন বলে, **‘খোদাভীরুদের জন্য প্রতিশ্রুত বেহেশ্‌ত সদৃশপূর্ণ’** (সূরা নং ১৩, আয়াত : ৩৬) যার অর্থ ইহা সাদৃশ্য স্বরূপ প্রকাশ করা হচ্ছে, এটা বাস্তব কিছু নয়’। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ হতে এটা স্পষ্ট যে প্রকৃত বেহেশ্‌ত সম্পূর্ণভাবে অন্যকিছু। নবী করীম (সা.) একথাও বলেছেন যে, শুধুমাত্র আপাত ও

বাহ্যিক বর্ণনার ওপর নির্ভর করা আমাদের উচিত নয়, কারণ বেহেশ্‌ত হলো এমন কিছু, যা কোন চর্মচক্ষু দর্শন করেনি অথবা কোন কর্ণ এর শব্দ শ্রবণ করেনি। যাহোক, বেহেশ্‌তের যেসব পুরস্কার ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি ঐসব বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলি আমরা দেখেছি এবং শুনেছি। উদাহরণ স্বরূপ–পবিত্র কুরআনের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, **'এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্‌ত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়'** (সূরা নং ২ আয়াত : ২৬)। এ আয়াতে 'ঈমান'-এর সাথে 'সৎকর্ম' এবং 'বাগান'-এর সাথে 'নহর'কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পরিণতি হচ্ছে 'বাগান' এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাধিত সৎকর্মের পরিণতি হচ্ছে নহরসমূহ। ঠিক যেভাবে পানি ছাড়া অথবা নিয়মিত পানি সরবরাহ ব্যতীত বাগান টিকে থাকতে পারে না, তেমনি সৎকর্মহীন ব্যক্তির ঈমান অর্থহীন হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঈমান ও বৃক্ষের মধ্যে বহুমাত্রিক সাদৃশ্য দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই ঈমান, যার প্রতি মুসলমানদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, তা হলো বৃক্ষসমূহের মত। একজন ঈমানদারের সৎকর্ম-এই বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের কাজ করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, এসব বিষয়ের ওপর যে যত বেশী চিন্তা করবে, তার কাছে এসবের অর্থ গভীর দর্শন ও তাৎপর্য তত বেশী প্রকাশ পাবে। ঠিক যেমন ভাল ফসল পেতে হলে একজন কৃষককে শুধুমাত্র বীজ বপন করলেই চলে না, এতে প্রয়োজনীয় পানি সেচ করতে হয়, তেমনি একজন আধ্যাত্মিক সাধককে আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার ফসল কাটার জন্য শুধু ঈমান আনয়নের বীজ বপন করলেই চলে না, তার আধ্যাত্মিক বাগানের জন্য পানি সেচেরও সুব্যবস্থা করে এর প্রতিপালন করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে তার সৎকর্মই সেই কাজটি করে থাকে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, সৎকর্ম ছাড়া ঈমান ঠিক সেরূপই অর্থহীন হয়, যেভাবে পানি সেচের অভাবে একটি সুন্দর বাগান অকেজো হয়ে পড়ে। বৃক্ষ যতই সুন্দর হোক এবং যত ভাল ফলই দিক তা অর্থহীন হয়ে পড়ে যখন এর মালীক এতে প্রয়োজনীয় পানি সেচ করার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। এতে এর যে পরিণতি হয় তা আমরা সবাই জানি। আধ্যাত্মিক জীবনে ঈমানরূপ বৃক্ষের অবস্থাও তেমনই সত্য। ঈমান হচ্ছে এক বৃক্ষ, যার জন্য সৎকর্ম হচ্ছে নহরের মত, যা একে বাঁচিয়ে রাখে এবং লালন পালন করে। অধিকন্তু, ঠিক যেভাবে বীজ বপন ও পানি সেচ করার পর ভাল ফসল পাবার বিষয় নিশ্চিত করতে একজন কৃষককে অন্যান্য কাজেও অনেক কঠিন পরিশ্রম করতে হয় আধ্যাত্মিক জগতেও একই রকম অবস্থা বিদ্যমান। আল্লাহ্‌ তাআলা এটা আবশ্যক এবং অপরিহার্য করেছেন যে, আধ্যাত্মিক পুরস্কারের ফল এবং দান পেতে হলে বড় প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম করা জরুরী"।

(মালফুযাত, ১০ম খন্ড পৃ: ৩৯৪-৩৯৬)।

একজন মানুষের নিজ কর্মই হচ্ছে বেহেশ্‌ত-তার আনন্দের প্রকৃত উৎস। যদি একজন মানুষ নিজ প্রকৃতিতে যদি ধর্মকে পরিত্যাগ না করে এবং সাম্যাবস্থার মাপকাঠি থেকে বিচ্যুত না হয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে আর তার আত্মা স্বর্গীত জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরগায় উপনীত হয়, তখন এমন লোক সেই সবল অঙ্গের মত হয়ে থাকে যা ঐসব সঙ্গত কর্মাদি সম্পাদন করে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তাকে সৃষ্টি করেছেন। এসব যথাযথ কর্ম সম্পাদনে সে একটা ব্যথা অনুভব না করে আনন্দ অনুভব করে। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, 'এবং যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য বাগান সমূহ রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত' (সূরা নং ২, আয়াত : ২৬)।

এ আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনাকে 'বাগান' এবং 'সৎকর্ম'কে 'পানির নহর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক। পানি ছাড়া যেমন বাগান সজীব হয় না এবং ফল দেয় না, তেমনি সৎকর্ম ছাড়াও কোন ঈমান উপকারে আসে না। এরূপে বেহেশ্‌ত হচ্ছে সৎকর্মের মধ্যে ধারণকৃত ঈমানের মূর্ত প্রতীকী প্রকাশ। নরকের ক্ষেত্রে যা বাস্তব বেহেশ্‌তের ক্ষেত্রে তদ্রূপ নয়; বেহেশ্‌ত এমন কিছু নয় যা বাহ্যিকভাবে অবস্থান করে। একজন মানুষের বেহেশ্‌ত তার অভ্যন্তর থেকেই উৎসারিত হয়।

বেহেশ্‌তের আনন্দ হচ্ছে এক বিশুদ্ধ প্রণোদনা যা এ জগতেই বিকশিত হয়। ঈমান হচ্ছে এক চারাগাছ এবং সৎকর্ম হচ্ছে পানির নহরের ন্যায় যা ঐ চারাগাছে পানি সিঞ্চন করে এবং এর সজীবতা ও জাঁকজমক অবস্থা বজায় রাখে। এই পৃথিবীতে বেহেশ্‌তের অবস্থান স্বপ্নের মত উপলব্ধি করা হয় কিন্তু পরজগতে তা বাস্তবরূপে অনুভূত হবে এবং পর্যবেক্ষণ করা যাবে। সেজন্য

বর্ণীত আছে যে, যখন বেহেশ্‌তবাসীদেরকে এসব দানে ভূষিত করা হবে, তারা বলবে যে, **“এগুলি তো সেই জিনিষ, যা পূর্বে আমাদেরকে দান করা হয়েছিল এবং পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ উপহার সামগ্রীসমূহ তাদের নিকট আনা হবে”** (সূরা নং ২ আয়াত : ২৬)। এতে এটা বুঝানো হয়নি যে, বেহেশ্‌তে দুধ, মধু আঙ্গুর, ডালিম ইত্যাদি দেয়া হবে, যেগুলি এ জগতে আমরা খেয়ে থাকি। বাহ্যিকভাবে এসব বস্তুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এসব বস্তু আমাদের আত্মাকে আলোকিত করে এবং খোদা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে। তাদের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আত্মা এবং ন্যায়নিষ্ঠা। সাদৃশ্যের কারণে ব্যক্ত কথা **‘পূর্বেও এগুলি আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল’** দ্বারা একথা বুঝায় না যে, সেগুলি বাস্তবে এ জগতেরই কোন বস্তু অথবা দান-সামগ্রী। এর আসল অর্থ হচ্ছে যেসব ঈমানদার সৎকর্মশীল, তারা নিজ হাতে এক বেহেশ্‌ত নির্মাণ করে, যার ফলসমূহ তারা পরজগতে উপভোগ করবে। যাহোক, আধ্যাত্মিকভাবে এজগতে যেহেতু তারা ঐ ফলের স্বাদ গ্রহণ করবে, সেহেতু পরজগতেও তারা তা চিন্‌তে পারবে এবং আশ্চর্য হয়ে বলবে যে এগুলতো একই রকম ফল বলে মনে হয় যেগুলি ইতোপূর্বে তারা পৃথিবীতে উপভোগ করেছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীকী বর্ণনা সেরূপই হবে যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি মানুষ এজগতে সাধন করে অথবা সাধনের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায় এবং পরজগতে তারা তা চিনতে পারবে।

(মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৮-২৯)।

ঈমান এক মহান সঞ্চিত সম্পদ এবং এটা সেই নাম যা কোন কিছু গ্রহণ করার সেই পর্যায়ে দেয়া হয় যার বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান এখনো অর্জিত হয়নি এবং এখনো কিছু সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সংগ্রাম বিদ্যমান। এ অবস্থায় যে লোক সত্যনিষ্ঠতা সহকারে অন্তর ও বাক্যদ্বারা সত্য বলে বর্ণনা করবে তাকেই মু’মিন বলা হয়। এমন লোকই খোদার দৃষ্টিতে ‘সত্যনিষ্ঠ’ বলে গণ্য হয়। একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে তার সত্যনিষ্ঠার কারণে বিশেষ দান স্বরূপ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তার জ্ঞানের উচ্চতর ধাপ সমূহ খুলে দেন। প্রকৃত পক্ষে এমন খাঁটি ঈমান ও খাঁটি বিশ্বাস দ্বারাই প্রকৃত বেহেশ্‌ত শুরু হয়। অতএব, পবিত্র কুরআনে যেখানেই বেহেশ্‌তের উল্লেখ আছে, তার পূর্বে ঈমান ও সৎকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঈমানের পুরস্কারের সাথে সৎকর্মের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, ‘বাগানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত’ (সূরা নং ২, আয়াত : ২৬)। এর অর্থ ঈমানের পুরস্কার হলো বেহেশ্‌তের বাগান এবং যেহেতু বাগানকে সবুজ ও মনোরম রাখতে পানির নহরের প্রয়োজন হয়, এমন প্রবাহমান পানির নহর হচ্ছে নেক কাজের প্রতিফল। এর বাস্তবতা হচ্ছে এইরূপ খাঁটি ঈমানদারের জন্য প্রত্যেক অবস্থায় এ জগতে তার জন্য বেহেশ্‌ত রয়েছে এবং বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি তার পরকালের জন্যও বিদ্যমান যে, যে নেক কাজ সে এ জগতে সম্পাদন করেছে, তা পরজগতে বহমান পানির নহরের এক সদৃশ্যরূপ পরিগ্রহ করবে। এ জগতেও আমরা এটা প্রত্যক্ষ করি যে, একজন লোক নেক কাজে যত বেশী উন্নতি করে এবং পাশাপাশি যত বেশী ঐসব মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে যেগুলি করলে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্যকারী বান্দা হিসেবে পরিগনিত হয় এবং যত বেশী আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনের কাজ থেকে সে বিরত থাকে, তার ঈমানের জোর তত বেশী বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক নতুন নেক আমল তার জন্য অধিকতর সন্তুষ্টি আনয়ন করে এবং সে গভীরতর অভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয় করে। আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে প্রাপ্ত জ্ঞান তাকে আনন্দ দান করতে শুরু করে এবং এভাবে সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যখন আল্লাহ্‌ নিজ রহমতে তাকে তাঁর ভালবাসা দান করেন, যার মধ্যে সে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র জ্যোতি পূর্ণভাবে তার হৃদয়কে আলোকিত করে এবং তার পথের সকল ধরনের তমসা ও বাধা অপসারিত হয়। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌তে পৌঁছানোর পথে অবস্থিত সব বাধা ও ক্লেশ, এর প্রত্যাশীকে এক মুহূর্তের জন্যেও উদ্বিগ্ন করেনা। এর পরিবর্তে খোদার পথে ক্লেশ সয়ে নেয়া এর পথিকদের জন্য আনন্দের উৎসে পরিণত হয়। এটাই হচ্ছে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়।

ঈমানের সাতটি স্তর ছাড়াও অতিরিক্ত আরো একটি সর্বোচ্চ স্তর রয়েছে যা কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় এবং তাঁর অশেষ কৃপায় অর্জিত হতে পারে। এজন্য বেহেশ্‌তের সাতটি দরজা ছাড়াও ৮ম একটি দরজার উল্লেখ রয়েছে যা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে খোলা হয়ে থাকে। এটা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, পরকালে যে বেহেশ্‌ত ও দোযখ দেখা যাবে, ঐগুলি সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। ঐগুলি একজন মানুষের ঈমান ও আমল দ্বারা গঠিত দোযখ-বেহেশ্‌তের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এবং এটাই হচ্ছে প্রকৃত দর্শন। এগুলি এমন কিছু হবে না যা মানুষকে বাইরে থেকে দেয়া হবে, বরং ঐগুলি এমন কিছু যা মানুষের ভিতর থেকেই উদ্ভূত হয়। একজন প্রকৃত ঈমানদার যে অবস্থাতেই

থাকুক না কেন, তার জন্য এ জগতেই একটি বেহেশ্‌ত আছে। এজগতে তার জন্য যে বেহেশ্‌ত রয়েছে তা-ই তার পরজগতের বেহেশ্‌তের প্রতিচ্ছবি ধারন করে। বিষয়টি কতই না স্পষ্ট যে, সকল মানুষের বেহেশ্‌ত তাদের নিজ নিজ ঈমান ও নেক আমল দ্বারাই গঠিত হয়। এর আনন্দ উপভোগের শুরুও এ জগতেই হয়ে থাকে। এটা এ জগতের সেই ঈমান ও নেক আমল যা পর জগতে বহমান পানির নহর সহ বেহেশ্‌তের বাগান হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয় (মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৮৬-৩৮৯)।

সর্বোচ্চ আনন্দ কেবলমাত্র আল্লাহতেই বিদ্যমান। 'জান্নাত' নামেও একে উল্লেখ করা হয়েছে যখন একে 'লুক্কায়িত' বা 'আচ্ছাদিত' অর্থে প্রকাশ করা হয়। এর নাম 'জান্নাত' বা বেহেশ্‌ত' এজন্য দেয়া হয়েছে যে এটা পুরস্কার এবং দান হিসেবে সকল প্রকার ভাল বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে। যাহোক, আল্লাহ্‌-ই হচ্ছেন প্রকৃত বেহেশ্‌ত এবং এ অবস্থার সাথে কোন প্রকারের উদ্বিগ্নতা বিদ্যমান থাকতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে সর্বোচ্চ পুরস্কারের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে–**'আল্লাহকে পাবার যে আনন্দ, এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আনন্দ'** (সূরা ৯, আয়াত : ৭২)।

একজন মানুষ সর্বদাই কোন না কোন সমস্যায় নিপতিত থাকে। যাহোক, যে যত বেশী আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হবে এবং নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী যত বেশী পরিমাণে ধারণ করবে, তার আরাম ও সান্ত্বনার মাত্রা হবে ততই অধিক। একই ভাবে সে যত বেশী আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করবে, তত বেশী পরিমাণ সে আল্লাহ্‌র দানও হাসিল করবে এবং আল্লাহ্‌র বদান্যতায় তার প্রাপ্য অংশও ততবেশী থাকবে (মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৩৭)।

একজন মানুষের জন্য এটা জরুরী যে, বেহেশ্‌তের আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতাকে এজগতেই অর্জনের চেষ্টা করা। খোদাভীরুতা ব্যতীত এ ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। চর্মচক্ষু দ্বারা কেউ খোদাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। যাহোক, খোদাভীরুতার চক্ষু একজন মানুষকে খোদা-দর্শনের সক্ষমতা দান করে। খোদাভীরুতার পথ অবলম্বন করলে একজন মানুষকে এটা অনুভব করতে হবে যে, সে খোদাকে দেখছে এবং এভাবে এমন সময় আসবে যখন সে নিজেই বলবে যে, সে বাস্তবিক পক্ষে খোদাকে দেখছে। এ ধরনের মানুষের জন্য এজগতে বেহেশ্‌তের অস্তিত্ব থাকার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণনা রয়েছে, যেমন–'যখন তাদেরকে সেখান থেকে ফলের একটি বরাদ্দ দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, 'এটাতো সেই বস্তু যা পূর্বেই আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল", (সূরা নং ২, আয়াত : ২৬)। অর্থাৎ পরকালে যখন তারা বেহেশ্‌তের বৃক্ষের ফলের স্বাদ গ্রহণ করবে তখন বলবে যে, ঐগুলি তো পূর্বেও তাদেরকে দান করা হয়েছিল–তারা ঐগুলিকে পূর্বে-আস্বাদিত ফলের অনুরূপ দেখতে পাবে। এতে এটা বুঝা যায় না যে, পূর্বে এ জগতে তারা বাস্তবে যে দুধ. মধু, ডালিম, আঙ্গুর ইত্যাদি খেয়েছিল, ঐগুলি হুবুহু সেগুলিই হবে। এ ধরনের সকল ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বেহেশ্‌তের পুরস্কার সমূহ যদি এমন বস্তুই হতো যে তা এজগতেই দেখা যায়, তাহলে মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পারস্পরিক সম অংশিদারিত্ব দেখা যেতো। তাহলে ইহজগত এর সাথে বেহেশ্‌তের পার্থক্য কি? পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী (সা.) এর হাদীস থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বেহেশ্‌তের দান এমন-ই যে, কোন চর্মচক্ষু ঐগুলি কখনো দেখেনি, কোন কর্ণ ঐগুলি শ্রবণ করেনি এবং এদের আস্বাদ পর্যন্ত কখনো কোন অন্তর ও মনে পৌছেনি। যাহোক, আমরা এ জগতের বস্তুসমূহ অবলোকন করি–ঐগুলি সকল চোক দেখে, সকল কান ঐগুলি শোনে এবং ঐগুলির ধারণা সকল অন্তর ও মন স্পর্শ করে। এথেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যদিও বেহেশ্‌তের পুরস্কারসমূহকে এ জগতের বস্তুসমূহের নামের সাথে তুলনা করে প্রকাশ করা হয়েছে, আসলে ঐগুলি এমন কিছু যা এ জগতের বস্তুসমূহ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে প্রশ্ন উঠে যে, তাহলে ঐসব শব্দাবলী– 'এটাতো সেই জিনিষ, যা ইতোপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল'–এর অর্থ কি? এখানে এর ব্যাখ্যা একই হবে যেভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত 'কিন্তু যারা এজগতে অন্ধ, তারা পরজগতেও অন্ধ থাকবে' (সূরা নং ১৭, আয়াত : ৭৩) এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[এখানে অন্ধ শব্দটি দ্বারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি হীনতাকে বুঝানো হয়েছে, দৈহিক অন্ধতাকে নয়।]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে তার প্রভু আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হতে ভয় পায়, তার জন্য রয়েছে দু'টি বেহেশ্‌ত' (সূরা নং ৫৫, আয়াত : ৪৭)। যে তার প্রভু আল্লাহ্‌র ভয় পায় এবং তার মহত্ব ও মর্যাদার সামনে ভীতি সহকারে দন্ডায়মান হয়–এমন লোকের জন্য দু'টি বেহেশ্‌ত রয়েছে–একটি এ জগতে এবং অন্যটি আখেরাতে।

যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের সময় তাদের মনের স্বার্থপরতার চিহ্ন মুছে ফেলে বিশুদ্ধ অন্তরে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র অন্বেষণ করে তারা এতে আনন্দ লাভ করতে শুরু করে এবং তখন তাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আধ্যাত্মিক পুষ্টি বিধানের বদান্যতা শুরু হয় যা আত্মাকে আলোকিত করে এবং আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান দান করে (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ১৭৮-১৭৯)।

মোট কথা হচ্ছে, খাঁটি ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকের জন্য এ জগতেও এবং পরকালেও বেহেশ্‌ত রয়েছে। আর খোদা দর্শনই হচ্ছে সেই প্রকৃত বেহেশ্‌ত।

জামা'ত অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

MTA-তে প্রদর্শিত সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান

গত ২৯, ৩০, ও ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর তারিখে MTA-তে প্রদর্শিত সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানটি প্রত্যহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৬০০ জন সদস্য ও সর্বমোট ১০৩ জন জেরে তবলীগ প্রদর্শন করেছেন। অত্র জামা'তের ১৫০ টি TV-তে উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রদর্শিত হয়েছে।

ওসীয়্যত সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১০ নভেম্বর বাদ আসর হতে বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে ওসীয়্যতকারী ভাই বোনদের নিয়া তালিম তরবিয়ত প্রসঙ্গে বিশেষ এক সেমিনার করা হয়। মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রারম্ভে কুরআন তেলাওয়াত করেন কাওসার আহমদ মঞ্জুর এবং পরে সভাপতি সাহেব দোয়া করান। দোয়ার পর একটি উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব শাহজাদা খাঁন। বক্তব্য রাখেন; ওসীয়্যতকারীদের মৌলিক করণীয়, ওসীয়্যতকারী বুযুর্গানদের জীবনের এক ঝলক, ওসীয়্যতকারীদের জীবনাদর্শ এ বিষয়গুলির ওপর যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোশারফ হোসেন সেক্রেটারী ওসীয়্যত, খন্দকার মোস্তাক আহমদ নায়েব আমীর ও মৌলানা নওশাদ আহমদ। শেষে সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনার শেষ করা হয়। উক্ত সেমিনারে ১২৫ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন

ওসীয়্যত সেমিনার

গত ১৩/১১/০৯ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কুমিল্লা জামা'তের উদ্যোগে এক ওসীয়্যত বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব ইয়াকুব লস্কর সাহবে, সেক্রেটারী মাল। এতে ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মাওলানা রবিউল ইসলাম এবং শেষে সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এই সেমিনারে মোট ৩২ জন সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন, এর মধ্যে একজন জেরে তবলীগ ভাইও ছিলেন।

আলহাজ্জ আলী আকবর ভূঁইয়া

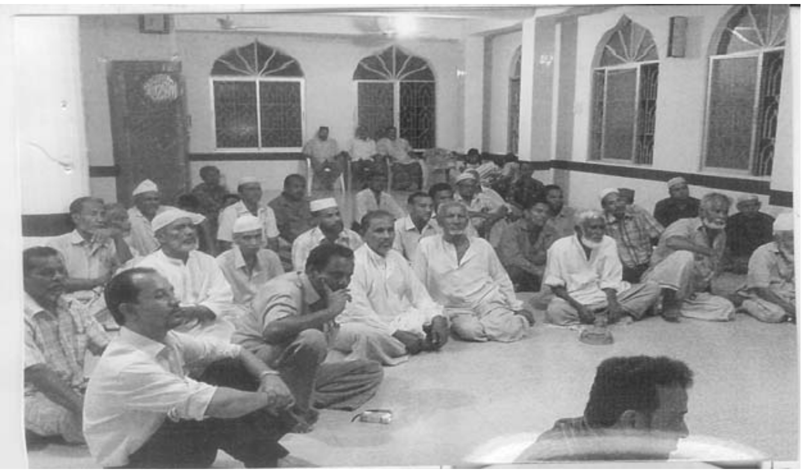

MTA-তে প্রদর্শিত সত্যের সন্ধান অনুষ্ঠানের দর্শক বৃন্দ

বিশেষ ওয়াকারে আমল

গত ১২/১১/০৯ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার জনাব মকবুল আহমদ সাহেব (সেক্রেটারী তবলীগ) এর উদ্যোগে ঘাটুরা জামা'তে এক বিশেষ ওয়াকারে আমল কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয়, এতে ঘাটুরার বাজার সংলগ্ন একটি ড্রেইন পরিষ্কার করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ভোর ৫ টা বাজে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, জনাব মোবারক উদ্দিন সাহেবের উপস্থিতিতে ড্রেইন পরিষ্কার কাজ আরম্ভ হয় এবং সকাল ৮টা বাজে কাজ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য বিষয় এই যে, আমাদের এই ওয়াকারে আমল কাজ পরিদর্শন করার জন্য ঘাটুরা গ্রামের দুই ওয়ার্ডের দু'জন পুরুষ মেম্বার ও একজন মহিলা মেম্বার আসেন। তারা আমাদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট প্রকাশ করে ও আমাদের কাজের জন্য উৎসাহিত করেন এছাড়া গ্রামের অন্যান্য মুরব্বীরাও আমাদের এই কাজ পরিদর্শন করেন। গ্রামবাসীরাও আমাদের এই কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেক্রেটারী তবলীগ সাহেব সবশেষে বললেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাই আমরা এই ড্রেইন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নেই। আমি আশা করি এই ড্রেইন পরিষ্কারের মাধ্যমে সারা গ্রামে এই কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, আহমদী ধর্ম হচ্ছে সেবা করার জন্য নিয়োজিত। তিনি আরো মনে করেন এই ওয়াকারে আমল এর ফলে ঘাটুরা গ্রামে তবলীগ এর ব্যাপারেও অনেক অবদান রাখবে। এই ওয়াকার আমলে ১০ জন আনসার, ১০ খোদ্দাম ও ৫ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে এই বিশেষ ওয়াকারে আমল কাজ সমাপ্ত হয়।

উজ্জ্বল আহমদ

তরবীয়তি ক্লাস

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফতুল্লাতে গত ২৩ ও ৩০ অক্টোবর জামা'তী তরবিয়তী ক্লাস নেওয়া হয় উক্ত ক্লাস শুক্রবার বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে অর্থসহ নামাযের ক্লাস নেওয়া হয়। উক্ত ক্লাসে আনসার খোদ্দাম ও আতফালগণ অংশগ্রহণ করেন। ১ম দিন ১৭ জন ও ২য় দিন ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। এ ক্লাসের মাধ্যমে সবার দীনি বিষয়াদি শিখার সু-ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত ক্লাসে সবাই আগ্রহ ভরে অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

চট্টগ্রাম জামা'তে 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত

গত ২৯, ৩০ ও ৩১ অক্টোবর ২০০৯ ইং ১লা নভেম্বর ২০০৯ MTA- তে সরাসরি সম্প্রচারিত (Live tale cast) প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য এখানে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সকল প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার প্রতিনিধি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গকে অনুষ্ঠানের সময়সূচী এবং চ্যানেলের ফিকোয়েন্সি নম্বর উল্লেখ করে আমন্ত্রণ জানিয়ে দাওয়াত পত্র দেয়া হয়।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে মেহমানগণ সহ আহমদী ভ্রাতাগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে উক্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

* পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের মাহিল্লা হালকা সহ বিশেষ করে চট্টগ্রামের মসজিদ বায়তুল বাসেত উক্ত আন্তর্জাতিক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে ১৪১ জন জেরে তবলীগ এবং ৬৬২ জন আহমদী সদস্যসহ আট শতাধিক শ্রোতা দর্শক উক্ত অনুষ্ঠানকে সানন্দে উপভোগ করেন। প্রতিদিন এখান থেকে ফোন ফ্যাক্স, ই-মেইলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় সহ জেরে তবলীগ মেহমানগণ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশ্ন পাঠিয়ে অংশ নিয়েছেন।

মোহাম্মদ হাসান

সত্যের সন্ধানে MTA (Live tale cast) আন্তর্জাতিক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের শ্রোতা দর্শক (মসজিদ বায়তুল বাসেত চট্টগ্রাম)

নাখালপাড়া হালকায় তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১ নভেম্বর ২০০৯ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার উদ্যোগে নাখালপাড়া হালকা মসজিদে এক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর উপস্থিত ছিলেন। তিনি আগত মেহমানদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। **MTA** -তে **LIVE সত্যের সন্ধানে** অনুষ্ঠানে নাখাপাড়া থেকে যারা সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন তারাও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে একজন ভাই আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করে বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত পরিচালনা ও দোয়া করান মিশনারী ইনচার্জ সাহেব। এই সভায় ২১ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ কামরুল আহসান

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা রিজিওনাল ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা রিজিওনাল ২য় বার্ষিক ইজতেমা গত ১৩ ও ১৪ নভেম্বর, ২০০৯ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহ আকুয়াস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আলহামদুলিল্লাহ্। ইজতেমায় ৪ জন জেলা নাযেম এবং ২৭ টি মজলিসের মধ্য থেকে ২২ টি স্থানীয় মজলিসের যয়ীম আলা/যয়ীম ও প্রতিনিধিসহ ১৩০ সদস্য যোগদান করেন।

১৩ নভেম্বর বাদ জুমুআ তেলাওয়াতে কুরআন থেকে পাঠ, স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর ইজতেমার উদ্বোধন করেন সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব কাউসার আলী মোল্লা। বাদ মাগরিব ও এশা নামাযের পর ইজতেমায় আগত সকল সদস্য হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা লন্ডন থেকে এম,টি,এ এর মাধ্যমে সরাসরি শুনার পর তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া জামা'তের এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সত্যতা সম্পর্কে আলোচনার পর ৬ জন জেরে তবলীগ ভ্রাতা বয়আত গ্রহণ করেন। ইজতেমায় তালিম তরবিয়তী কার্যক্রমের পাশাপাশি কুরআন তেলাওয়াত, নযম, দ্বীনি মালুমাতের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা নেয়া হয়।

১৪ নভেম্বর শনিবার বাদ যোহর দুপুর ২-৩০ পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

উত্তরবঙ্গ রিজিওনাল মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ইজতেমা ২০০৯ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে গত ৬ ও ৭ নভেম্বর ২ দিন ব্যাপী উত্তরবঙ্গ রিজিওনাল ইজতেমা ভাতগাঁও মসজিদে অত্যন্ত সুন্দর ও সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

এই রিজিওনের ১১ টি মজলিস থেকে প্রায়

৭০ জন আনসার, যয়ীম/যয়ীমে আলা, ২ জন জেলা নাযেম ইজতেমায় শরীক হন। কেন্দ্র থেকে জনাব ফজলে এলাহী কায়েদ তালিম এবং জনাব খালেদ বিন কাশেম জিহানত ও জিসমানী উপস্থিত ছিলেন। জুমুআর নামাযের পর মোহতরম ফজলে এলাহী সাহেবের সভাপতিত্বে ইজতেমার উদ্বোধনী শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া, আহাদ পাঠ ও নযমের পর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম রিজিওনাল নাজেম উত্তরবঙ্গ। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। মাগরিব ও এশা একত্রে জমা নামাযের পরে সন্ধ্যা ৮ টায় লন্ডন থেকে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খোতবা এম,টিএ-এর মাধ্যমে সবাইকে শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়। রাত ৯ টায় সভাপতি সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় মজলিসের রিপোর্ট পেশ ও সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ নভেম্বর বাজামাত তাহাজ্জুদ, ফজর ও দরসে কুরআনের পর ধর্মীয় জ্ঞানের ওপরে বিভিন্ন পরীক্ষা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১১ টায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোহতারম ফজলে এলাহী সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহেব এর মূল্যবান সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্তি হয়।

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আজিমপুর হালকায়–তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/১০/০৯ রোজ রবিবার আজিমপুর হালকার লাজনা ইমাইল্লাহ্ এর উদ্যোগে ৩৮/১ আজিমপুর রোড এর বাসায় বাদ আসর এক বিশেষ তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আজিমপুর হালকার প্রেসিডেন্ট জনাবা মুনিরা বেগম। প্রথমে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আমাতু সাফি, আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট। এবং পরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর "আমাদের শিক্ষা' পুস্তক পাঠ করেন হালকার সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তবলীগ জনাবা সেগোফতা ফেরদৌস সাহেবা। এছাড়া ৫ জন নাসেরাত সহ প্রায় সকলেই ধারাবাহিকভাবে পুস্তক পাঠ করেন। উক্ত তরবিয়তী সভায় ৩ জন নওমোবাইন সহ মোট ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় নতুন আহমদীসহ পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সদস্যের বাসায় প্রতি মাসের ৫ তারিখে একটি করে তরবিয়তী ও তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫/১১/০৯ ইং একই বাসায় আরও একটি সভা অত্যন্ত কামিয়াবীর সাথে সম্পন্ন হয়। সবশেষে বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্ কর্মকর্তা জনাবা শাহিনা হাকিম সাহেবার দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

মুনিরা বেগম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নাখালপাড়া হালকায়–তালিম তরবীয়তি সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার বাদ আসর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে নাখালপাড়া হালকায় জনাব রফিক আহমদ সাহেবের বাসায় স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট মোহতরমা আখি নূর চন্দন সাহেবার সভাপতিত্বে এক তালিম তরবিয়তী সভা কুরআন তেলাওয়াত, হাদীস ও আহাদনামা পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রচিত পুস্তিকা থেকে আলোচনা করেন ফাইজা শারমিন এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবা। শেষে মিসেস রফিক আহমদ সাহেবার আন্তরিক আপ্যায়ন ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ হয়।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

হাতে কলমে জামা'তী কাজের প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বগুড়া, দিনাজপুর-পঞ্চগড় জিলা আমেলা ও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ভাতগাঁও আমেলা সদস্যদের মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে গত ২০/১১/০৯ রোজ শুক্রবার সকাল ১০-৪৫ মিনিট হতে ১টা পর্যন্ত বিকাল ৩-৩০ মিনিট হতে ৪-৪৫ মি. পর্যন্ত ভাতগাঁও মসজিদে হাতে কলমে জামা'তী কাজের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আবু নঈম আল মাহমুদ সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। আলোচনা করেন ইদ্রিস আলী বাবু, সহকারী মোহতামীম আতফাল। সদর সাহেবের মজলিসি কাজের সার্কুলার পাঠ করেন মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, জেলা কায়েদ। অধিবেশনে কুরআন পাঠ করেন ইয়ামিন আহমদ। ১ম অধিবেশনে দোয়া পরিচালনা ও আহাদ পাঠ করেন সভাপতি সাহেব সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। সমাপ্তি অধিবেশনে দোয়া করান মাওলানা রইছ আহমদ। উক্ত কর্মশালায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বৃহত্তর সিলেট জেলায় জেলা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২০/১১/০৯ ইং এক দিন ব্যাপী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর সিলেট জেলা মজলিসে জেলা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর মজলিস থেকে মোহতরম আবু তারিক, মোআবিন সদর ও মোহতরম মনিরুল ইসলাম স্বপন, মোহতামীম তরবীয়ত এবং রিজিওনাল মজলিস থেকে মোহতরম এস,এম ইব্রাহীম, রিজিওনাল কায়েদ, চট্টগ্রাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহতরম উজ্জ্বল আহমদ, জেলা কায়েদ, বি,বাড়িয়া। সকাল থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এ কর্মশালার কার্যক্রম চলে।

সোহেল আহমদ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ২১/১১/০৯ইং রোজ শনিবার সকাল ৭-৩০ মি. এর সময় বীরগাঁও জামা'তের জনাব রায়ফত আলী সাহেবের জৈষ্ঠ্যপুত্র মোস্তাক আহমদ (বাবুল) ৩০ বছর বয়সে হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তার অকাল মৃত্যুতে তার মা, বাবা ভাই বোন আত্মীয়-স্বজন মর্মাহত। সে বীরগাঁও জামা'তের সাবেক কায়েদ ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করেন। তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জন্যও খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাদেরকে সবরে জামিল ও ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা দান করেন।

দোয়াপ্রার্থী
জানে আলম

* অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ০৬/১২/০৯ইং তারুয়া জামা'তের সদস্য জনাব রায়ফত অলি মিয়া সাহেব ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন), মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জন্যও খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

শুভ বিবাহ

* গত ৯/০৬/০৯ইং মোছাঃ তানজিলা আফরিন, পিতা-আব্দুস সামাদ, আহমদনগর এর সাথে মোহাম্মদ আরফিন ইমতিয়াজ ইউনিক, পিতা-মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আতগারা, মিস্ত্রীপাড়া, রংপুর এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮০৫/০৯

* গত ০৬/১১/০৯ইং মোছাঃ তাছলিমা সুলতানা, পিতা- মরহুম ছিবগাতুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে মামুনুর রহমান (কানু), পিতা-মান্নাফ চৌধুরী, জামালপুর এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮০৬/০৯

* গত ১২/১১/০৯ইং মোছাঃ সাবিহা আক্তার (ইভা), পিতা-মোহাম্মদ ইলিয়াছ মোল্লা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে মোহাম্মদ শহীদুর রহমান, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ আলী, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮০৭/০৯

* গত ২৬/০৬/০৯ইং মোছাঃ জান্নাতুল রোজী, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, ১৯/১ নগর খানপুর, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে এস, এ, এম বশির, পিতা-মরহুম জকিউদ্দিন আহমদ, ৬/৬ পাওয়ার রোড, ময়মনসিংহ এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮০৮/০৯

* গত ২০/০৫/০৯ইং মোছাঃ বুশরা আক্তার, পিতা-মৃতঃ সৈয়দ আহমদ খন্দকার, উত্তর মাসদাইর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে তৌফিক আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, ১৯/১ নগর খানপুর নরায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮০৯/০৯

* গত ০২/১০/০৯ইং মোছাঃ মনছুরা জাহান, পিতা-এ্যাডঃ মনজুর আলম, ধানিখোলা, ময়মনসিংহ এর সাথে সৈয়দ জাফর আহমদ, পিতা-সৈয়দ মোবাশ্বের আহমদ, মৌলভী পাড়া, বি.বাড়িয়া এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮১০/০৯

* গত ০২/১০/০৯ইং মোছাঃ ফাতেমা মনোয়ারা, পিতা-মরহুম নজরুল হক, উত্তর আহমদীপাড়া, কান্দিপাড়া বি, বাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, পিতা-চৌধুরী মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম, ৬২, উত্তর মাসদাইর, গাবতলী, নারায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮১১/০৯

* গত ২৩/১০/০৯ইং মোছাঃ তানিয়া আক্তার, পিতা-জনাব কামাল হোসেন সিরাজ, দক্ষিণ হালি শহর, বন্দর টিলা, চট্টগ্রাম এর সাথে মোহাম্মদ জাহিদুল করীম, পিতা-আবুল ফজল মোহাম্মদ তৌয়ব, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড় এর বিবাহ ৭২,০০১/- (বাহাত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮১২/০৯

* গত ২৮/১০/০৯ইং মোছাঃ রেহেনা খাতুন, পিতা- জামাত আলী ঢালী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ বাবলু রহমান ফকীর, পিতা-মরহুম নাজের আলী ফকীর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ১৮,০০১/- (আঠারো হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৮১৩/০৯

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদী গত ৩১ অক্টোবর ২০০৯ সংখ্যায় ৩৩ নং পাতায় শুভ বিবাহ কলামে *সাবাতুন নূর* এর স্থলে সাবাহুন-নূর আর মৃত *শামসুল মাষ্টার হক* এর স্থলে মৃত শামসুল হক মাষ্টার এবং মোহরানা ৭০,০০০/- এর স্থলে ১,২৫,০০০/- পড়তে হবে।

স্মৃতির পাতা থেকে–

হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে কুড়িয়ে পাওয়া

মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী

আমার গর্ভধারিনী মা ছিলেন সদর মোয়াল্লেম ফকির ইয়াকুব আলী সাহেবের চাচী কসিয়া বেগম। তিনি ভাতিজাকে আবু মিয়া বলে ডাকতেন। এক ভিটাতেই আমার বাবা-চাচাদের বাড়ী ছিল। আমার ছোট কালে মা আমার চাচাত ভাইকে বলতেন ''আবু মিয়া আমার ছেলেটাকে তোমাদের দলে (আহমদীয়া তরিকা) নিয়ে যাও।'' আমারও বাল্যকাল থেকে আহমদীয়া জামা'তের প্রতি অনুরাগ ছিল, ফলে আমি আমার চাচাতো ভাই ফকির ইয়াকুব আলীর সংস্পর্শে এসে আহমদীয়াত গ্রহণ করি। আমি তখন থেকেই জামা'তের প্রায় সব অনুষ্ঠানেই অংশ নিতাম। কিন্তু আমার বাবা আমার আহমদী হওয়ার প্রথম দিকে কিছুই জানতেন না। তিনি আহমদী বিরোধী ছিলেন।

১৯৫০ দশকের শেষের দিকের ঘটনা। আমি তখন স্কুলের চৌকাঠ পার হবো। আমাদের জামা'তে অর্থাৎ দুর্গারামপুরে একজন গরীব লোক তখন আহমদী হয়েছিল, লোকটির নাম ছিল বুরজু মিয়া। তার আহমদী হওয়া উপলক্ষ্যে গ্রামের গয়ের-আহমদী মাতব্বররা তার ওপর নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ করে। সে ছিল একজন দৈনন্দিন খেটে খাওয়া মানুষ। অত্যাচারের এক পর্যায়ে মাতব্বররা তাকে এক-ঘরে করে দেয়। কেউ তাকে কাজ দেয় না, এমতাবস্থায় না খেতে পেয়ে অভুক্ত থাকতে থাকতে খুব দুর্বল হয়ে যান। তখন মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব দুর্গারামপুরে সদর মোয়াল্লেম হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গ্রামের গয়ের-আহমদী মৌলভীরা বুরজু মিয়ার সুস্থ্যতার জন্য তার কাছে এসে খতমে-সেফা পড়াতে চাইল, তাকে সাহায্য করতে চাইল। শর্ত হল তাকে আহমদীয়াত ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে তাদেরকে বললেন যে,''তার খতমে-শেফার দরকার নেই।'' তিনি মৌলভী সাহেবদের বললেন,''তোমরা আবু মিয়া অর্থাৎ ফকির ইয়াকুব আলীকে ডেকে আন।'' এ কথা শুনে মৌলভীরা চলে গেলেন। এক পর্যায়ে দারিদ্রতায় দুর্বল হয়ে বুরজু মিয়া মারা যায়। দুর্গারামপুর জামা'তে লোকের সংখ্যা তখন খুব কম। তার মৃত্যুর খবর পাঠানো হলো তারুয়াতে, সেখান থেকে মানুষ আসলে জানাজা এবং দাফন সম্পন্ন হবে। এই অবসরে শফর আলী চাচা কবর খোড়া আরম্ভ করলেন। আশেপাশের লোকজন এবং মৌলভী মাতব্বররা দেখতে লাগলেন যে কবর দিবে কেমন করে। আমি শফর আলী চাচার সাথে কবর খোড়ায় অংশ নিলাম, সাথে সাথে সারা গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল ঐ গ্রামের মোখালেফাতকারীদের প্রধান নেতার ছেলে মৃত কাদিয়ানীর দাফনের জন্য কবর খুড়ছে। এবং সেইসাথে আমার আহমদী হওয়ার কথা আর গোপন থাকল না। আমার বাবা একথা শুনে আমাকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করে বাড়ী থেকে বাহির করে দিলেন। তখন আমি দিনের বেলা গ্রামের বাঁশজঙ্গলে লুকিয়ে থাকতাম এবং রাতে গ্রামের লোকজনের বাসায় অনুরোধ করে খুব কষ্টে আজ এখানে কাল সেখানে থাকতাম। আমার বিমাতা আমাকে খুব আদর করতেন। তিনি লুকিয়ে আমাকে খাবার দিতেন। এভাবে কিছুদিন গেল। হঠাৎ একদিন বাজারে টিন (ঢোল) পিটিয়ে প্রচার করা হলো যে, মাওলানা তাজুল ইসলাম (তখনকার অত্র অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মৌলভী) বহাস করার জন্য দুর্গারামপুর আসছেন। মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেবও সেই বাহাসের সংবাদ শুনে মনে মনে তৈয়ার হতে থাকলেন। এ বাহাসের কথা প্রচারের দুইএকদিন পরে হঠাৎ মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব তার সাথে আরো মৌলভীদের নিয়ে দুর্গারামপুরে পৌছলেন। তার উপস্থিতিতে এলাকায় রীতিমত সারা পড়ে গেল। দুর্গারামপুরের পার্শে হরিপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের মানুষরা ছিল লাঠিয়াল। তারা মাওলানা তাজুল ইসলামের কাছে গিয়ে বললেন,''আপনি কেন দুর্গারামপুর এসেছেন?'' তিনি বললেন,''দুর্গারামপুরের মাতব্বরদের জিজ্ঞাসা কর, তারা কেন আমাকে নিয়ে আসলেন, তারা আমাকে এনেছে কাদিয়ানীদের সাথে বাহাসের জন্য।'' তখন লাঠিয়ালরা বলল,''আমরাতো কাদিয়ানীদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তারাতো কোন বাহাসের কথা কিছু জানে না। আপনি কি এলাকায় এসেছেন গন্ডগোল করার উদ্দেশ্যে, আপনি এ মুহূর্তে লঞ্চে করে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া চলে যান।'' তাদের বিরোধিতার মুখে মাওলানা তাজুল ইসলাম ফিরে গেলেন।

মাওলানা তাজুল ইসলামের দুর্গারামপুরে অবস্থানের একটি ঘটনা। একদিন সন্ধ্যার সময় ছোট ছেলেরা যেমন বিড়ালের গলায় রশি লাগিয়ে টেনে খেলা করে ঠিক তেমনিভাবে আমার গলায় গামছা বেধে টেনে হিচড়ে এক বাঁশজঙ্গল থেকে আমাকে আমার বাবা মাওলানা সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ''হুজুর, আমার জালিম ছেলেকে নিয়ে এসেছি, বলেন এখন কি করব?'' মাওলানা সাহেব তাৎক্ষণিক কিছু বললেন না। আমি সালাম বললে আমার সালামের উত্তর কেউ দিলেন না। ঘর ভর্তি মানুষ কোথাও বসার জায়গা নেই, আমাকে কেউ বসতেও বলে না। এমতাবস্থায় আমি মাওলানা সাহেবের খাটে জায়গা দেখে সেখানে বসলাম। তখন অন্যান্য মৌলভীরা আমাকে ঘাড়ে ধরে মাটিতে নামিয় দিল, এই বলে যে- ''কত বড় বেয়াদব হুজুরের পাশে বসে।'' তখন মাওলানা সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন, ''তোর মির্জা যে নবী তা, এই কুরআন শরীফ থেকে দেখিয়ে দে। তিনি একই কথা দ্বিতীয়বারের পর যখন তৃতীয়বার বললেন, তখন আমি বললাম, মাওলানা সাহেব একটু ভালো ভাবে কথা বলেন। ''তোর মির্জা কি?'' মির্জা কি আমার? মাওলানা শুনে বল্লেন,''ঠিক আছে। এখানে (ঘরের এক পাশে রাখা) দুই বস্তা ধর্মীয় পুস্তক আছে এখান থেকে দেখাও।'' আমাকে ধরে নিয়ে আসার সময় মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব আমার পকেটে মহাসুসংবাদ বইটি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর কি মর্জি আমি বইটি খুললাম আর আমার সামনে সুরা সাফ এর ৭নং আয়াত

দৃশ্যমান হলো। যেখানে ইসমুহু আহম্মদ শব্দ আছে। মাওলানা সাহেব আমার উত্তর শুনে চুপ করে গেলেন যে- এই ছেলেতো একেবারে অজ্ঞ না। আমার বাবা মাওলানা তাজুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলেন, ''বলেন হুজুর এখন আমি একে নিয়ে কি করব? মাওলানা বললেন, কেটে মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দাও।'' কথা শুনে আমার বাবা আমাকে মারার জন্য লাঠি হাতে ঝাপিয়ে পড়লেন, অন্ধকারে তিনি আমাকে মনে করে আমার পাশে বসা মসজিদের ইমামকে বেহুশের মত মারতে লাগলেন। আমি বাবার হাতে মার খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য নিমিশের মধ্যে বেড়ার ফাঁক দিয়ে পালিয়ে এক দৌড় দিয়ে মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি তিনি জায়নামাজে সেজদায় পড়ে আছেন, তাঁর চোঁখ ভেজা।

মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব থাকতেন একটি বাংলা ঘরে (বৈঠক খানায়)। সেই ঘরেই আমরা নামাজ পড়তাম। ঘরটি ছিল রাস্তার পার্শে এবং এর মালিক ছিলেন একজন আহমদী। ঘরটির সামনে নামাযীদের অযু করার জন্য একটি মাটির বড় পাত্রে পানি রাখার ব্যবস্থা ছিল। আমি নামায পড়ার জন্য পানি দিয়ে অযু করতে লাগলাম, পানি রাখার গামলাটিতে বিরুদ্ধবাদীরা শয়তানী করে পায়খানা করে রেখেছিল। অযুর জন্য আমি প্রথমে হাত ধুতে নিতেই আমার হাত বর্জ্যে ভরে গেল এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে আমি বুঝতে পেরে নদী থেকে গোসল করে পাক হয়ে মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেবের কাছে ফিরে আসলাম। শেষ রাতে উনার সাথে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ি; স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে আছি, তখন শুভ্র সাদা পোশাক পরা অতি নূরানী চেহারা মোবারকের এক বুজুর্গ সেখানে আসলেন এবং আমাকে দেখে বললেন; আহা! এই ছেলেটা গর্তে পড়ে আছে, একে গর্ত থেকে উঠাও উঠাও! একথা শুনার পর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার পর আমি ঢাকা ৪নং বকশী বাজারে চলে আসলাম এবং ঢাকায় আসাটা ছিল আমার গর্ত থেকে উঠা। সেই থেকে আমি ঢাকাতেই আছি। আমার আর দুর্গারামপুরে স্থায়ীভাবে ফেরা হলো না।

মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেবের মত মানুষরা ছিলেন আল্লাহর ঐ সমস্ত নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বর অধিকারী, যাঁরা এক অসহায় বালককে আশু অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে চোঁখের জলের বিনিময়ে তাৎক্ষণিক আল্লাহর কাছ থেকে দোয়া কবুলিয়ত লাভের ঈমান আমলের নিদর্শন দেখাতেন। আল্লাহ তাঁকে বেহেশতে উত্তম মোকামে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।

এক নীরব কর্মীর চিরবিদায়

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আজ এমন একজন বিদায়ী কর্মীর কথা আলোকপাত করবো, যিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জের সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্বে রত ছিলেন। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম দাদা মোহাম্মদ মুসলিম মিয়া। যিনি ১৯৯৪ইং সনে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি আহমদীয়াতে ভালবাসায় আজ হতে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ঘাটুরা জামা'তের গৌতমপাড়া হতে স্বপবিারে রংপুর জেলার মাহিগঞ্জ এলাকার টেক্সদীঘির পাড় বসতি স্থাপন করেন। সেই সময় জনাব নয়া মিয়া নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বয়আত করে আহমদী হয়েছিলেন। তার অনুরোধে ঘাটুরা, তারুয়া, ক্রোড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে অনেকেই উক্ত এলাকাতে বসতি স্থাপন করেন। মরহুম নয়া মিয়া সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি টেক্সদীঘির পাড় হতে ৬ কিলোমিটার দূরে মেকুরা গ্রামে বসবাস করতেন। টেক্সদীঘির পাড়ে তার অনেক সম্পত্তি ছিল। সেখান থেকে প্রায় দু'বিঘা জমি মসজিদের নামে দেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

আমার দাদার তিন ছেলে ও একমাত্র মেয়ে ছিল। আমার আব্বা মরহুম মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (ধনমিয়া) বড় ছিলেন। ছোট দুই ভাই মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (মনমিয়া) ও মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম (আনুমিয়া) ১৯৯৩/৯৪ ইং সনে মারা যান। আমার মরহুম পিতা নিজ বাপ ভাইকে হারিয়ে নিজেকে খুবই একা মনে করতে লাগলেন আর বলতেন একে একে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এত শোকের পরও তিনি ধৈর্যের পরিচয় দেন। ১৯৯৭ ইং সনে আমার মাতাও মারা যান। স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি আরও অসহায় হয়ে পরেন। যদিও পরবর্তীতে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। এতো পরীক্ষার পরও জামা'তের দায়িত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেননি। আমার মরহুম পিতা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সহজ সরল ছিলেন। আর্থিক ও জাগতিক কোন লোভ-লালসা তার ছিল না। জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি তিনি পূর্ণ আনুগত্যশীল ছিলেন। কথা খুব কম বলতেন। মেহমান নেওয়াজী ছিল তার প্রতিদিনের সঙ্গী। এমন লোক নাই যে, তার বাড়ীতে এসে না খেয়ে ফিরে গেছেন।

তিনি খুবই সাদাসিদা ভাবে চলা ফেরা করতেন। কোন অহংকার বা গৌরব ভাব তার মাঝে ছিল না। তিনি শেষ বার যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন বার বার জামা'তের সদস্যদের কথা জিজ্ঞাসা করতেন আর বলতেন কে চাঁদা তুলবে কে খাতা-পত্র লেখা-লেখি করবে। জামা'তের প্রতি আনুগত্যশীল এই ব্যক্তিটি গত ০২/০৯/০৯ইং রোজ রবিবার দিবাগত রাত ১১: ১৫ মি: নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেক্রেটারী মাল ও অন্যান্য দায়িত্বে ছিলেন। মরহুমের ওসিয়্যত মোতাবেক এই অধম তাঁর জানাযার নামায পড়াই এবং মাহীগঞ্জ জামা'তের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ওসীয়্যত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থ হওয়াতে আর তা করা হয়নি। তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি জামা'তের নামে ১ শতাংশ জমি দিয়ে গেছেন। মরহুম বিধবা স্ত্রী দুই ছেলে, ছয় মেয়ে ১০ নাতনী ও ৬ নাতী এবং অনেক আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য জামা'তের সকলের কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি। সেই সাথে মরহুমের পরিবারের সাবরে জামিল এর জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন এই নিষ্ঠাবান কর্মীকে জান্নাতুল ফেরদৌসে ভূষিত করেন। (আমীন)

তরমুজ চাষ পদ্ধতি

ভুমিকা:- তরমুজ সারাদেশে চাষ না হলেও ছেলে বুড়ো সকলেই এফলটি পছন্দ করে থাকে। ইহা একটি সুমিষ্ট অর্থকরী ফল। এ ফলটি তৃপ্তিদায়ক এবং তৃষ্ণা নিবারক। বাংলদেশের যশোর , পাবনা, ঢাকা, বগুরা, রাজশাহী, নাটোর, ফরিদপুর ,পটুয়াখালী এবং বরগুণা জেলায় বেশী চাষ হয়ে থাকে।

জলবায়ু ও মাটি:-

তরমুজ চাষের জন্য শুষ্ক জলবায়ু এবং প্রচুর সূর্যালোক প্রয়োজন। ইহা একটি খরা প্রতিরোধক ফসল। তবে জলাবদ্ধতা একবারে সহ্য করতে পারেনা। দীর্ঘ সময় আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে ফলন এবং গুণাগুণ দুই বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারেনা। ১৫^{O}C ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নিম্ন তাপমাত্রায় গাছ মরে যায়। ২২^{O}C-৩০^{O}C ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তরমুজ চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী । আর্দ্র আবহাওয়ায় ফল ও বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়। রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। শুষ্ক আবহাওয়ায় প্রখর রৌদ্রে ফল আগাম পাকে। ফলের মিষ্টতা এবং সুগন্ধ বাড়ে। নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত সবধরনের মাটিতে তরমুজ চাষ করা যায়। তবে উর্বর বেলে দোআঁশ মাটি নদীর তীরবর্তী চরাঞ্চলের পলিমাটি তরমুজ চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম। মাটির পি,এইচ ৫.৫ থেকে ৭.০০ ইহার জন্য উপযোগী।

জাত নির্বাচন:–

পতেঙ্গা ও গোয়ালন্দ জাতের মিষ্টতা এবং স্বাদ আমদানীকৃত জাত অপেক্ষা কম হওয়ায় এ জাত দুইটির চাষ এখন নাই বললেই চলে। বর্তমানে আমাদের দেশে উন্নতমানের অধিকাংশ হাইব্রিড তরমুজের জাত জাপান, তাইওয়ান, কোরিয়া সহ কয়েকটি দেশ থেকে আমদানী করে চাষ করা হচ্ছে। এর মধ্যে টপইল্ড, গ্লোরি,ওয়াল্ড কুইন, চ্যাম্পিয়ন অন্যতম।

জীবন কাল:-

বীজ বপনের ৯০-১২০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

বীজ বপনের সময়:- পৌষ মাস তরমুজের বীজ বপনের সর্বোত্তম সময়। আগাম ফসলের জন্য দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে যেমন চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল , পটুয়াখালী, এবং বরগুনা জেলায় মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন করতে হবে। নাবী ফসলের জন্য মাঘ মাসে বীজ বপন করতে হবে। উত্তর অঞ্চলে জেলা সমুহে যেমন:- রাজশাহী, বগুরা, নাটোর জেলায় মাঘ মাসে বীজ বপন করা যাবে। তবে পলিথিনের ছাউনির নীচে পৌষ মাসে চারা করে মৌসুম এগিয়ে আনা যাবে। চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় বৃষ্টি বাদল কমে যাওয়ার পর আশ্বিন মাসে বীজ বপন করে পৌষ মাসে ফসল তোলা যাবে।

বীজের হার:- সরাসরি বপনের জন্য ৮ গ্রাম /প্রতি শতাংশ। চারা করে রোপনের জন্য ৪ গ্রাম / প্রতি শতাংশ।

বীজের অংকুরোদগমন:-

তরমুজের বীজ ১৫^{O}C ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অথবা এর নীচের তাপমাত্রায় গজায় না। বীজের অংকুরোদগমনের জন্য কমপক্ষে ২৫^{O}C -৩০^{O}C সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। শীতকালে একটুকরা কাপড়ে বীজ পুটলি বেধে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে পুটলিটি খড়ের / গোবরের ভিতর অথবা মাটির চুলার পার্শ্বে উত্তাপ পায় এমন দূরত্বে গর্ত খুড়ে কয়েকদিন রেখে দিলে বীজ অংকুরিত হবে। বীজের পুটলিটি শরীরের সাথে(কোমরে)বেঁধে রাখলে অথবা বীজ একটি পলিব্যাগে নিয়ে ১০০ ওয়াট বৈদ্যুতিক বাল্বের কাছাকাছি ঝুলিয়ে রেখে দিলে ২-৩ দিনের মধ্যে অংকুরিত হবে।

চারা উৎপাদন:-

সরাসরি বীজ বপন অথবা চারা উৎপাদন করে মাদায় চারা রোপন করে তরমুজ চাষ করা যায়। তরমুজের বীজ খুবই ব্যয়বহুল। তাই সরাসরি বীজ বপনেরে পরিবর্তে চারা তৈরী করে রোপন করা উত্তম। এতে অপচয় কম হবে।

মাঠ থেকে বেলে দোআঁশ / পলি দোআশঁ মাটি সংগ্রহ করে রৌদ্রে শুকাতে হবে। মাটি গুরা করে নিয়ে কাঁকর আগাছা উত্তমরূপে পরিস্কার করতে হবে। ১ ঝুড়ি মাটির সাথে অর্ধেক ঝুড়ি পঁচা গোবর/ কম্পোস্ট উত্তম রূপে মিশাতে হবে।

প্রতি ঝুড়ি মাটির সাথে ৬ গ্রাম ইউরিয়া, ৪ গ্রাম টিএসপি, ৬ গ্রাম পটাশ, ১ গ্রাম ক্লোরোডেন এবং ১ গ্রাম ব্যপটান অথবা অনুরূপ কোন রোগনাশক মিশিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। ৫-৭ দিন পর মাটি ১০সে:মি: × ১৩ সে:মি: আকারের পলি ব্যাগে ভর্তি করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের জন্য পলিব্যাগ এর নীচের দিকে কাঁটা দিয়ে কয়েকটি ছিদ্র করে দিতে হবে। অংকুরিত বীজ প্রতিটি পলিব্যাগে ২-৩ টি করে রোপন করতে হবে।

জমি তৈরী ও বেড তৈরী:-

তরমুজের শিকড় মাটির সামন্য নীচ দিয়ে সমস্ত জমিতে ছড়ায়। তাই ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুল ঝুরে করে দিতে হবে। মূল জমি থেকে কমপক্ষে ১৫-২০ সে:মি: উঁচু বেড তৈরী করতে হবে। বেডের প্রসস্থ ২.৫ মিটার হবে। লম্বা খেতের দৈর্ঘ্য অনুপাতে হবে।

জমির আইলের পার্শ্বে এবং দুই বেডের মাঝখানে ৬০ সে:মি: প্রসস্থ এবং ২০ সে:মি:গভীর সেচ নালা করতে হবে। ২ বেড পর পর ৩০ সে:মি: প্রসস্থ ২০ সে:মি: গভীর নিষ্কাশন নালা করতে হবে। প্রতি বেডের প্রস্থের পাশ থেকে ১ মিটর ভিতরে বেডের মাঝ বরাবর ৫৫সে মি:×৫৫সেমি:×৪৫ সেমি: আকারের প্রথম গর্ত করতে হবে। এরপর ২ মিটার অন্তর অন্তর একই আকারের গর্ত করতে হবে। বেডের উপর খড়ের আস্তরন দিতে হবে। প্রতি মাদায় ২ টি করে চারা রোপন করতে হবে।

সারের মাত্রা এবং প্রয়োগ:-

একরে ২০ টন তরমুজ জন্মালে ইহা মাটি থেকে ৪৮ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফরাস ও ৭২ কেজি পটাশিয়াম পরিশোষণ করে। খৈল তরমুজের শাঁস

সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয় করে তবে অধিক মাত্রায় জৈব সার প্রয়োগে শাসে আঁশ জন্মায় । চারা রোপনের ১০-১২ দিন পূর্বে মৌল সার জমি ও মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সেচ দিয়ে সার পচিয়ে চারা রোপন করতে হবে। ১ম কিস্তি সার চারা লাগানোর ১২০-১৫ দিন পর গাছের গোড়ায় রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তি গাছের ফুল আসার সময় গোড়ায় দুই দিকে ৪০ সে:মি: দূরে অগভীর নালা কেটে প্রয়োগ করতে হবে। তৃতীয় কিস্তি গাছের গোড়ার ৫০ সেমি দূরে ২য় কিস্তির বিপরীত দুই দিকে একই ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এতে শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত কম হবে এবং সারের অপচয় হ্রাস পাবে।

মূল জমিতে সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতি:- সরাসরি বীজ বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে মূলজমি এবং মাদার মাটিতে নির্ধারিত মাত্রায় মৌল সার মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে হালকা সেচ দিয়ে সার পচিয়ে নিতে হবে। প্রতি মাদায় ৪টি করে বীজ বপন করতে হবে। ২মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ২ মিটার অন্তর অন্তর ৫৫সে:মি:× ৫৫সে:মি:×৪৫সে:মি: আকারের মাদা তৈরী করতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে বাকী চারা উঠিয়ে ফেলতে হবে।

প্রুনিং :- তরমুজের সব শাখা প্রশাখা রেখে দিলে ঘন অঙ্গজ বৃদ্ধির কারনে ফলন হ্রাস পায়। রোগবালাই পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ফুল ও ফল ধরার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি হয়। গাছে ৮-১০ টি পাতা হলে গোড়া থেকো ৫টি গিট রেখে প্রধান ডগার মাথা কেটে ফেলতে হবে। পরবর্তীতে প্রধান ডগার সাথে ৪/৫ টি শাখা রেখে বাকী সবগুলি শাখা কচি অবস্থায় কেটে ফেলতে হবে। প্রতি গাছে গোড়া থেকে পৌনে এক মিটারের মধ্যে প্রতিটি শাখায় ১টি করে ফল রাখতে হবে। অতিরিক্ত ফলগুলো ফেলে দিলে মান সম্পন্ন ফল পাওয়া যাবে।

পরাগায়ন:-ইহা একটি পরপরগায়িত উদ্ভিদ। একই গাছে স্ত্রী এবং পুরুষ ফুল আলাদা আলাদা হয়। সাধারনত মৌমাছি দ্বারা পরপরাগায়িত হয় । ইহা ছাড়া অন্যান্য পোকামাকড় এবং বাতাসের মাধ্যমে পরপরাগায়িত হয়। পরাগায়নে অসুবিধা হলে একই দিনে প্রস্ফুটিত পুরুষ ফুলের রেনু নিয়ে কৃত্রিম উপায় স্ত্রী ফুল পরাগায়িত করা যেতে পারে। এর ফলে ফুল ঝরেনা এবং আকার ও নষ্ট হয়না।

পরবর্তী পরিচর্যাঃ- তরমুজ কিছুটা খরা সহ্য করতে পারে। তবুও শুকনা মৌসুমে প্রতিবার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে। ভাসানো সেচ দেয়া যাবেনা।

নালায় এমনভাবে সেচ দিতে হবে। যেন বেড/জমি আস্তে আস্তে পানি শুষে নিতে পারে। সমস্থ বেড/জমি ভিজে যাবে কিন্তি জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকবে না। মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। স্যাঁত স্যাঁতে মাটিতে রোগের আক্রমন বাড়ে, ফল পচে যায়, মিষ্টতা কমে যায়। জমিতে খড়ের আস্তরণ দেয়া ভাল। জমিতে আগাছা জন্মালে ছোট থাকতেই নিড়ানি দিয়ে মূলসহ তুলে ফেলতে হবে।

ফসল সংগ্রহঃ- সাধারনত জাতভেদে বীজ বপনের ৯০-১২০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল মার্বেল আকার ধারণের ৩০ দিনের মধ্যে ফল পরিপক্কতা লাভ করে এবং তোলা যায়। ফলে মার্বেল আকার ধারনের তারিখ সম্বলিত লেবেল দেয়া হলে ৩০ দিন পর নিশ্চিত পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। গাছের প্রথম ফলটি পাকতে কিছুটা বিলম্ব হয়। আবার আবহাওয়া উষ্ণ এবং শুষ্ক হলে আগাম এবং নাবী উভয় জাতের ফল কিছুটা আগাম পাকে। পাকা ফল ওজনে হালকা হয়। পানিতে ভেসে থাকে। আঙ্গুলে টোকা দিলে ড্যাব ড্যাব আওয়াজ হবে। বোটার আকড়ি শুকিয়ে যাবে। পিছনের দিকে ফুল ঝরে পড়বে। ত্বকে উজ্জ্বল্য বাড়বে। ফল কাঁচা হলে আঙ্গুলে টোকা দিলে মেটালিক শব্দ হবে। ফল বোট সহ বিকালে সংগ্রহ করতে হবে। দূরবর্তী বাজরে বিপণনের জন্য পাকার কিঞ্চত পূর্বে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

আধুনিক জাত একরে ২০.০০টন জন্মে।

পোকা মাকড় এর আক্রমন ঃ-

(ক) মাছি পোকা:

এ পোকার আক্রমণে কচি অবস্থায় তরমুজ ফল নষ্ঠ হয়ে যায় ফলে ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ পোকা তরমজের মধ্যে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের ভিতরে খেয়ে নষ্ঠ করে ফেলে। এ পোকার আক্রমণের ফলে প্রায় ৫০-৭০ ভাগ ফল নষ্ট হয়ে যায়। কীটনাশক ব্যবহার করেও এ পোকা ভালভাবে দমন করা যায় না ।

দমন ব্যবস্থা:-

এ পোক দুই ধাপে কার্যকরভাবে দমন করা যায়।

(১) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ:- আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত ফল দ্রুত সংগ্রহ করে ১০-১২ সে:মি: মাটির নীচে পুতে ফেলতে হবে।

(২) সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করে:- কিউলিওর নামক সেক্স ফেরোমন ও সাবান পানির ফাঁদের মাধ্যমে প্রচুর পরিমানে পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা যায়। ফাঁদ প্রতি **এক মিলি** পরিমান সেক্স

ফেরোমন এক খন্ড তুলার টুকরায় ভিজিয়ে সাবান পানি ফাঁদের প্লাস্টিক পাত্রের মুখ হতে ৩-৪ সে:মি: নীচে একটি সরু তার দিয়ে স্থাপন করতে হবে। ফেরোমনের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ মাছি পোকা প্লাস্টিক পাত্রেরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সাবান পানিতে আটকে মারা পড়ে। ৬০ দিন পর পর ফেরোমন পরিবর্তন করেতে হবে।

(খ) পামকিন বিটেল:-

লাল পামকিন বিটল তরমুজ গাছের পাতা এবং শিকড়ে ব্যাপক ক্ষতি করে। ঠিক সময়ে এদের দমন না করলে তরমুজের ফলন কমে যেতে পারে।

পামকিন বিটলের পূর্ণ বয়স্ক পোকা চারা গছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ

পাতা খেয়ে ফেলে। এ পোকা বয়স্ক গাছের পাতার শিরা উপশিরাগুলো রেখে পাতার সম্পূর্ণ সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমন করে। এদের কীড়া শিকড় বা মাটির নীচে থাকা কান্ড ছিদ্র করে ফেলে ।তাই গাছ ঢলে পড়ে এবং পরিশেষে শুকিয়ে মরে যায়। অনেক সময় এরা চারা গাছ সম্পূর্ণ মেরে ফেলে বলে ক্ষেতে একধিকবার বীজ বুনতে হয়।

দমন ব্যবস্থাঃ-

চারা আক্রান্ত হলে হাত দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে। ক্ষেত সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে। চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমন থেকে গাছ বেচে যাবে। আক্রমণের হার বেশী হলে চারা গজানোর পর প্রতি মাদার চারদিকে মাটির সাথে চারা প্রতি ২-৫ গ্রাম অনুমোদিত দানাদার কীটনাশক মিশিয়ে গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে।

(গ) কাঁটালে পাকা বা এপিল্যাকনা বিটলঃ

কাঁটালে পোকাও তরমুজের ব্যপক ক্ষতিসাধন করতে পাবে। এ পোকা পাতার শিরাগুলোর মাঝের অংশ খেয়ে ফেলে। মধ্য শিরা বাদে পাতার সমস্ত অংশ খেয়ে ঝাঝরা করে ফেলতে পারে। ফলের উপরি ভাগের কিছু অংশ খেয়ে ফেলতে পারে অথবা ছোট ছিদ্র করতে পারে।

কাঁটালে পোকা ডিম্বাকার এবং পিঠে কাল ফোটা যুক্ত বাদামী রংয়ের কীড়ার রং ফ্যাকাশে হলুদ এবং পিঠের উপরিভাগে শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট ছোট ছোট কাটা দ্বারা আবৃত থাকে।

দমন ব্যবস্থাঃ- পোকা সহ আক্রান্ত পাতা হাত বাছাই করে মেরে ফেলতে হবে। নিমতেল ৫ মিলি +৫মিলি ট্রিক্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করতে হবে। আক্রমন অত্যন্ত বেশী হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রেকরতে হবে।

(ঘ) থ্রিপস পোকাঃ- থ্রিপস পোকার আক্রমনে তরমুজের উৎপাদন ব্যাপকভাবেহ্রাস পায়। পূর্ণাঙ্গ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক থ্রিপস পাতা থেকে রস চুসে খায়। পাতার মধ্যশিরার নিকটবর্তী এলাকা বাদামী রং ধারন করে ও শুকিয়ে যায়। নৌকার খোলের ন্যায় পাতা উপরের দিকে কুঁকড়িয়ে যায়। গাঢ় বাদামী রংয়ের পূর্ণাঙ্গ থ্রিপস পোকা খুবই ছোট , সরু ও লম্বাকৃতির । খালি চোখে কোনমতে এদের দেখা যায়। দমন ব্যবস্থাঃ- ৫ গ্রাম পরিমাণ গুড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচের দিকে স্প্রে করতে হবে। ক্ষেতে সাদা রঙের ৩০ সেমি × ৩০সেমি আকারের বোর্ডে পাতলা করে গ্রীজ আঠা লাগিয়ে কাঠির সাহায্যে ৩ মিটার দূরে দূরে আঠা ফাঁদ পেতে থ্রিপস পোকা আকৃষ্ট করে মারা।

এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করতে হবে। আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশী হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি পরিমান) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই

(ক) ফিউজেরিয়াম উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগঃ- চারা ও বড় গাছের পাতা এবং গাছ হঠাৎ করে ঢলে পড়ে, পাতা হলুদ বা বাদামি রং ধারণ করে। পরবর্তী সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনাঃ-

তরমুজকে ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও ঠান্ডাজনিত প্রতিকুলতা থেকে রক্ষার জন্য ১২ দিন বয়সের লাউ অথবা মিষ্টি কুমড়ার চারার সাথে ১৫ দিন বয়সের তরমুজের চারার জোড় কলম করতে হবে। তরমুজের জমিতে পলিথিন মাল্চ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে (৩২-৩৩^{0} সেঃপ্রায়) চাষ করা যেতে পারে। ক্যাপটান ২গ্রা প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। **(খ) পাউডারী মিলডিউঃ-**

আক্রান্ত পাতার উপর পাউডারের মত আবরণ দেখা যায়। অনেক সময় পাতা ক্রমশঃ হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনাঃ- শস্য পর্যায় অনুসরণ ও পরিস্কার চাষাবাদ করতে হবে। থিওভিট ২ গ্রাম ঔষধ প্রতি লিটার পনিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

(মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান)
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আ:মু:জা: বাংলাদেশ

লেখা আহ্বান

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, শীঘ্রই মরহুম মৌলভী ছলিমুল্লাহ্ সাহেবের 'নাজমুল মাহদী' বই এর নতুন এডিশন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে–এই উপলক্ষ্যে এই বইটিতে তাঁর জীবনীর অংশটি আরো সমৃদ্ধ করার জন্য জামা'তের সম্মানিত সদস্যদের কাছে মরহুম মৌলভী ছলিমুল্লাহ্ সাহেবের জীবনের কোন ঈমান বর্ধক ঘটনা জানা থাকলে তা আমাদের কাছে লিখে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১০ এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। তা যদি ছাপানোর যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তা আমরা উক্ত নতুন এডিশনে সংযোজন করব, ইনশাআল্লাহ্।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা–
শরীফুল হাকীম আহমদ
মোহতামীম ইশায়াত
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনা : এম, আহমদ

লস্কর-ই-তৈয়্যবার ১৮ সদস্য বাংলাদেশে ॥

পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গী সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়্যবার ১৮ সদস্যের একটি টিম সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বলে গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য এসেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বারিধারার মার্কিন দূতাবাস ও ভারতীয় হাইকমিশনে আত্মঘাতী হামলার পাশাপাশি তারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা করেছিল।

সম্প্রতি আমেরিকার শিকাগোতে গ্রেফতার হওয়া লস্কর-ই-তৈয়্যবার শীর্ষ নেতা আব্দুর রহমান সাইদ, ভারতের কেরালা রাজ্যে গ্রেফতার হওয়া দুই নেতা এবং বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া লস্কর-ই-তৈয়্যবার ৭ নেতার কাছ থেকে এসব তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

(যুগান্তর, ১১ ডিসেম্বর ২০০৯)

রাজাকারের তালিকা তৈরী করা হবে, জানালেন এইচটি ইমাম ॥

প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন এবং প্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম বলেছেন, এবার রাজাকারদের তালিকা তৈরী করা হবে। আগামী প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানানোর জন্যই সরকার এই তালিকা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে শনিবার প্রশিকা আয়োজিত নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।

(জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৯)

বিতর্কের মধ্যেই নোবেল পদক গ্রহণ করলেন বারাক ওবামা ॥

বিশ্বে যুদ্ধ ও রক্তপাত বন্ধের আহ্বান জানানোর দু'দিনের মাথায়ই ইরাক ও আফগানিস্থানে নতুন করে সৈন্য প্রেরণ এবং তার পদক প্রাপ্তিতে হাজারো সমালোচনার মাঝেই শান্তিতে নোবেল গ্রহণ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার বেলা ২ টায় নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই পদক গ্রহণ করেন তিনি।

অসলো সিটি হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে এদিন ওবামা ছাড়াও হাজির ছিলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জেন্স স্টোলটেনবার্গ, স্থানীয় ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক, গুণী ব্যক্তি এবং অন্যান্য বিভাগে এ বছরের নোবেল পদকজয়ীরা। বিভিন্ন বিভাগে নোবেলজয়ী অন্যান্যের মতই ওবামাও পুরস্কার হিসেবে পেলেন একটি সম্মাননাপত্র, স্বর্ণের মেডেল ও ১৪ লাখ মার্কিন ডলার সমমানের অর্থ।

(যুগান্তর, ১১ ডিসেম্বর ২০০৯)

মাংস কম খান ধরিত্রী বাঁচান ॥

যুক্তরাজ্য সরকারের পরামর্শক সংস্থা সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট কমিশন (এসডিসি) খাদ্যাভ্যাসে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও ক্যান্সারের মত প্রাণঘাতী ব্যাধি মোকাবেলার জন্য শুক্রবার প্রকাশিত একটি রিপোর্টে তারা এই সুপারিশ করেছে। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার বরাত দিয়ে দি হিন্দু অন লাইন এ খবর দিয়েছে। তারা বলেছে, বৃটিশদের মাংস ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণের মাত্রা সীমিতকরণসহ বর্জ্য হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে গবাদি পশু ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠাগুলো স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হবে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন দফতর যাদের সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক রয়েছে সেই দফতরগুলোর সঙ্গে উপদেষ্টাদের সম্পর্কে দূরত্ব তৈরী হতে পারে।

রিপোর্টের সুপারিশমতো কাজ করা হলে ভোক্তাসাধারণ মাছ-মাংস ও দুগ্ধজাত খাবার খাওয়া কমিয়ে তার পরিবর্তে মৌসুমী ফলমূল ও শাকসব্জির ওপরই বেশী করে ঝুঁকবে। এতে করে বর্তমানে সমস্যাগ্রস্থ গোবাদি পশুর খামারিরা আরো শঙ্কটের মুখে পড়বে। রিপোর্টে বলা হয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর ৭০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব।

(জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৯)

কফি ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় ॥

জনপ্রিয় পানীয় কফি মূত্রথলির ক্যান্সরা নিরাময় করতে পারে। মার্কিন গবেষকরা জানিয়েছেন কফি মূত্রথলির ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক। যারা কফি পান করেন এবং যারা কফি পান করেন না তাদের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত কফি পান করেন তাদের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমপক্ষে ৬০ ভাগ কম। কফি মানব শরীরের শর্করা এবং সেক্স হরমনের মাত্রা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যার ফলে মানবদেহে মূত্রথলিতে ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস পায়। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের এ ধরনের একটি গবেষণা, ক্যান্সার রিসার্চ কনফারেন্স সংক্রান্ত একটি আমেরিকান এসোসিয়েশনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(সূত্র বিবিসি, ইনকিলাব, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯)